অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা
তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের
সাধানাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত "**সরল ব্রহ্মচর্য্য**", "**সংযম সাধনা**", "**জীবনের প্রথম প্রভাত**", **অসংযমের মূলোচ্ছেদ**" প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত "**কুমারীর পবিত্রতা**" প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত "**বিধবার জীবনযজ্ঞ**" প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত "**সধবার সংযম**", "**বিবাহিতের জীবন সাধনা**" ও "**বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য**" প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের
শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পরিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,
বারাণসী-২২১০১০

ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

তৃতীয় খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

তৃতীয় খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী-১০

মূল্য ঃ ত্রিশ টাকা (মাশুল স্বতন্ত্র)
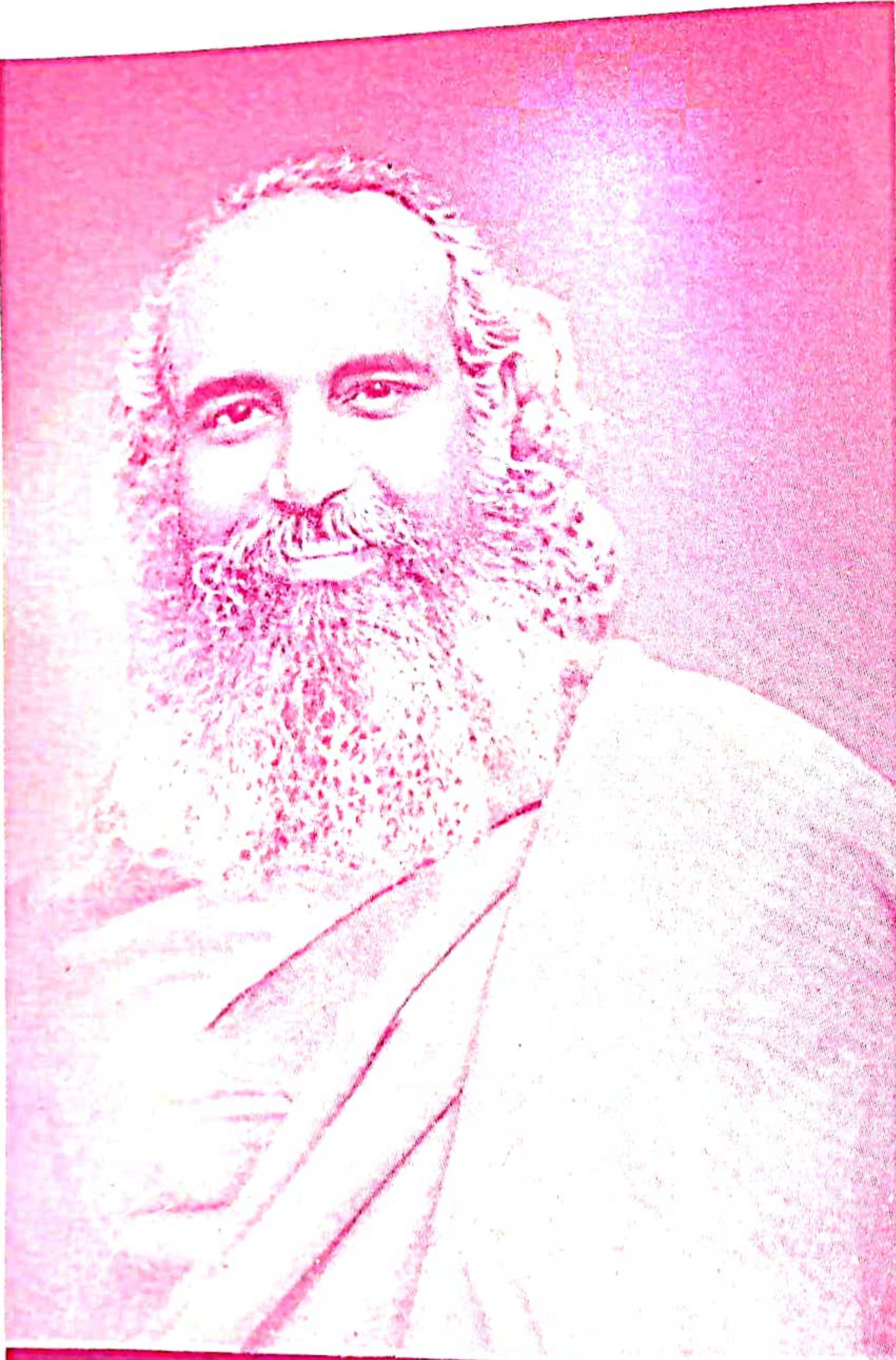
ধৃতং প্রেম্না

তৃতীয় খণ্ড

(১)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমরা সর্ব্বসাধারণের নিকটে ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, সংযম ও ভগবৎসাধনার প্রয়োজনীয়তার দিকটাকে বড় করিয়া ধর। যাহাদের সমাজের অতি নিম্নস্তরের অবনত-দশাগ্রস্ত নারকী জীব বলিয়া মনে হয়, তাহাদের মধ্যে অনেক স্বর্গের দেবতা বাস করিতেছেন। উপযুক্তভাবে উপস্থাপন করিতে পারিলে সদ্‌ভাব, মহদাদর্শ, উন্নত চিন্তা ও অভিনব প্রেরণা তাহারা অতি সহজে গ্রহণ করিতে পারে। বিজ্ঞানের ভক্তেরা দেশের কল্পিত উন্নতির জন্য নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী যাহা যাহা করিবার করুন, ভগবানের ভক্তেরা সাধন-নিষ্ঠ প্রজ্ঞার প্রতাপে সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন নিম্নতম তলের লোকদের ভিতরেও ব্রাহ্মণ্য জাগাইতে রত থাকুক।

ধৃতং প্রেম্না

যাহা করিবার, ভাবিয়া করিও কিন্তু ত্বরিত করিবে। ভাবিতে ভাবিতেই শতাব্দী ফুরাইলে চলিবে না। আবার, না ভাবিয়া না চিন্তিয়া হঠাৎ কোনও কাজে হাত দিয়া বসিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আশিস নিও। তোমার পত্র পাইয়া বিস্মিত হই নাই। কারণ, প্রেমই মানুষের স্বভাব। ধর্ম্মের নামে দেশ-বিভাগ হইয়া গেল। কত জনের জন্মভূমি বিদেশে পরিণত হইল। আর এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন গ্রামের গরীব মুসলমানরা নববর্ষের দিনে আমাকে গভীর প্রেম সহকারে স্মরণ করিতেছেন, ইহা ভাবিতে কাহার না আনন্দ হয়? ইনি হিন্দু, ইনি মুসলমান আর তিনি খ্রীষ্টান, ইহা ত' নিতান্ত একটা দৈবাধীন ব্যাপার। কিন্তু আমরা সকলেই যে মানুষ, ইহা হইতেছে প্রতিজনের পক্ষে এক সর্ব্বজনীন সত্য। আজ যে খ্রীষ্টান, কাল সে হিন্দু হইতে পারে। আজ যে হিন্দু, কাল সে মুসলমান হইতে পারে। আজ যে মুসলমান, কাল সে খ্রীষ্টান হইতে পারে। কিন্তু আজ যে মানুষ, সে কালও মানুষ, পরশুও মানুষ, তরশুও মানুষ। ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু মনুষ্যত্ব পরিবর্ত্তনশীল

নহে। মত-পথের পার্থক্য সত্ত্বেও এক মানুষ অপর মানুষকে ভালবাসিবে, ইহাই ত' স্বভাবের নিয়ম। আমরা স্বভাবচ্যুত হইয়াছি বলিয়াই না মানুষ হইয়াও মানুষকে ঘৃণা করি, মানুষকে বিদ্বেষ করি। নববর্ষের প্রেম যাঁহারা আমাকে জানাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিজনকে আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইও এবং তাঁহাদের বলিও যে দেশ-কালের ব্যবচ্ছেদ সত্ত্বেও আমি চিরকাল তাঁহাদেরই আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা আশিস নিও। বহুবার আমি তোমাদের জানাইয়াছি যে বেনামী পত্র লিখিয়া তাহার সাহায্যে যাহারা ভগবানের নাম প্রচারের বিদ্‌ঘুটে কৌশল অবলম্বন করে, তাহাদের পত্রানুযায়ী কাজ না করিলে পাপ হয় না কিম্বা তাহাতে ভয়ের কারণও নাই। হিমালয় হইতে এক সাধু বাহির হইয়া বলিয়াছেন যে, ভগবানের অমুক নামটি নয়খানি পত্রে লিখিয়া বিতরণ না করিলে নয় দিনের মধ্যে বিশেষ ক্ষতি হইবে আর বিতরণ করিলে নয় দিনের মধ্যে মহামঙ্গল হইবে, এসব ভীতি বা প্রলোভনে পরিচালিত হইয়া কাজ করা মূর্খতা।

ভগবানের নাম প্রচার তোমাদের প্রত্যেকেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য কাজ। কিন্তু চতুর লোকে আসিয়া জোর করিয়া তোমাদের দিয়া নাম প্রচার করাইবে আর তাহা তোমাদের নিজ নিজ প্রিয় নামও নহে এবং তাহাও করাইবে ভয় দেখাইয়া আর প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়া,—ইহা সহনীয় নহে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশ। এখানে একগাছি চুল ছিঁড়িয়া নিয়া তুক্‌তাক করিবার ভয় দেখাইলে ভাল মানুষও পাগল হইয়া যায়। তুক্‌তাক করিতেও হয় না। মনসা, শীতলা, শনি, রাহু, কেতু প্রভৃতি যে কোনও একজনের নামের দোহাই দিয়া চখ রাঙ্গাইয়া কথা কহিলে এদেশে বিনা মন্ত্রে বিনা তন্ত্রে নিরীহ বেচারীদের ভিটায় ঘুঘু চড়ে। সেই দেশে একখানা বেনামী পত্রে তোমাকে পরমেশ্বরের কোনও একটী নাম প্রচারের নির্দ্দেশ দেওয়ার মধ্যে সাত্ত্বিক তাৎপর্য্যটা কি? ভাল কাজও ভয়ের দাস হইয়া করা উচিত নহে, কারণ ভয় কখনো প্রেমের ধার ধারে না। যে ভাবে ভগবানের নাম প্রচার করিলে প্রাণে জাগিবে প্রেম, ভগবানের যে নাম প্রচার করিলে অন্তরে জন্মিবে তৃপ্তি, সেভাবে এবং তাহাই প্রচারে লাগিয়া যাও। প্রতিজ্ঞা কর, ভয় আর প্রলোভনকে পায়ের তলায় দাবাইয়া রাখিয়া নিষ্পেষণ করিয়া হত্যা করিবে। ভয়ের অধীন হইবে না, প্রলোভনের অধীন হইবে না।

কেহ হয়ত তোমাকে যুক্তি দেখাইতে পারে,—আরে, নয়খানা কাগজে ভগবানেরই ত' নাম লিখিতে বলা হইয়াছে, তবে আর আপত্তি করিবে কেন? তোমার যুক্তি এই হইবে যে,—এমন সৎকার্য্য ত' অনুরোধ করিলেই করিতে পারিতাম, ভয় দেখান কেন, প্রলোভনই বা কেন দেখান হইবে? একজন আমাকে যে ভয় এবং প্রলোভন

দেখাইয়াছে, তাহা অন্যায় জানিবার পরেও আমি আবার অপরের প্রতি তাহাই করিব কেন?

এই বিষয়ে আমি অনেকবার তোমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া দিয়াছি। তোমরা যে কেন এর পরেও এই একই কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহা বুঝিতে পারি না। তোমাদের জীবনকে প্রেমময় কর। প্রেমের স্বভাবে তোমরা ভগবানের নামকে প্রচার করিবার ব্রত গ্রহণ কর। তোমাদের সেই পবিত্র কার্য্যের সহিত ভয় বা প্রলোভনের ভেজাল মিশাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সৎসঙ্গগুণে মানুষের মনের অস্ফুট সদ্‌বৃত্তি সহজে প্রকট ও পরিস্ফুট হয়। সুতরাং তোমরা সর্ব্বদা সৎসঙ্গ করিবে।

তোমাদের প্রতিটি প্রতিবেশীর ভিতরে যাহাতে সদনুশীলন বাড়ে, তাহা তোমরা করিবে। কারণ, প্রতিবেশীরা সৎ না হইলে একাকী কেহ দীর্ঘকাল সৎ থাকিতে পারে না।

প্রতিদিনকার কাজে কর্ম্মে যেই সকল লোকের সঙ্গে আনাগোনা হয়, তাহাদের প্রতি জনের ভিতরে যাহাতে সদিচ্ছা ও সদনুশীলন

বাড়ে, তাহার দিকেও লক্ষ্য দিবে। নতুবা নিজের চরিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইবে না।

যেই সহরে বাস কর, সেখানকার প্রত্যেকটী প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরীয় প্রেমের প্রসারের জন্য যত্নশীল হইবে। কেননা, তাহা দ্বারা স্থানীয় পরিস্থিতির পবিত্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তোমার নিজেরও ঈশ্বর-প্রীতি বর্দ্ধনের সম্ভাবনা আছে।

নিজের ভিতরে সহস্র সদ্‌গুণের সমাবেশ ঘটিলেও তোমার মধ্যে আরও কেন অসংখ্য সদ্‌গুণ বিকশিত হইল না, ইহা ভাবিয়া লজ্জিত থাকিবে। কেননা এই জাতীয় লজ্জা তোমাকে বিনয় দিবে এবং বিনয় হইতে পথভ্রান্তি হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা বাড়িবে।

চতুর্দ্দিকে পল্লী ও জনপদ সমূহে মাঝে মাঝে সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ম্মাভিযান পরিচালন করিবে এবং জনগণকে সৎপথাশ্রিত করিবার প্রয়াস-কালে নিজেরা আরও সৎ আরও মহৎ হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৩ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। যে সকল বিঘ্ন-বিপত্তিতে নিজেকে পরিবেষ্টিত দেখিতেছ, তাহার সবগুলিই

বাতাসে লীন হইয়া যাইবে। তুমি অনুদ্বিগ্ন মনে ঈশ্বর-চিন্তন কর এবং পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবকুলের প্রতি অন্তরের প্রেমানুশীলন করিতে থাক। সকলকে আপন ভাবিয়া এবং নিজেকে সকলের আপন জানিয়া সহজে শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-সন্নিহিত হইতে পারিবে।

কয়বারই ত' ঠিক করিলাম, তোমাদের ওখানে যাই। কিন্তু একমাত্র বিমান ছাড়া যাতায়াতের কোনও রাস্তা কোন দিক দিয়া উন্মুক্ত নাই। আকাশের অবস্থাও সকল সময়ে বিমান-চালনার উপযোগী থাকে না। শুনিলাম, এইজন্যই তোমাদের ওখানে নিয়মিত বিমান চলাচলের কোন ব্যবস্থাও নাই। এই সকল কারণে এতদিন আমার যাওয়া হয় নাই। কিন্তু তোমাদের প্রাণও টানিতেছে, আমার প্রাণও তাই। সুতরাং অল্পকাল পরে তোমাদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ হয়ত হইবে। কিন্তু তোমরা এই অবসরকালটুকু সৎচর্চ্চায়, সৎচিন্তায়, সদনুশীলনে, সৎসঙ্গে পূর্ণ সদ্ব্যবহারে আন। আমি ত' বাবা কোন সাধকও নহি, কোন মহাপুরুষও নই। আমি তোমাদের ন্যায় একটি সাধারণ মানুষ। কিন্তু তোমাদের ওখানে সদনুশীলন ধারাবাহিকভাবে চলিবার ফলে উত্তম পরিবেশ সৃষ্ট হইলে আমি গিয়া পাইব অন্তরের অপার শান্তি, তৃপ্তি এবং পুষ্টি। সুতরাং এই সময়টুকু তোমরা বসিয়া থাকিও না।

একটু খুঁজিলেই দেখিতে পাইবে, তোমার সমভাবের ভাবুক চারিদিকে আরও রহিয়াছেন। ঐ পাহাড়, ঐ নদী কেবলই নির্জ্জন নহে। প্রাণভরা ভগবৎ-প্রীতি লইয়া উহারই আড়ালে আড়ালে, উহারই আনাচে কানাচে কত সদাত্মা দীর্ঘকাল ধরিয়া উপযুক্ত

সঙ্গীদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। হরিনামের ঝঙ্কার তুলিয়া একটুখানি মাথা তুলিয়া দাঁড়াও। চারিদিক হইতে তাঁহারা তোমাকে দেখিতে পাইয়া সপ্রেম বাহু-বিস্তার করিয়া ছুটিয়া আসিবেন। তুমি যেমন প্রেমের কাঙ্গাল, তাঁহারাও ঠিক তেমনি। কিন্তু হরিনামের সঙ্কেতধ্বনি ছাড়া তাঁহারা তোমাকে চিনিবেন কি করিয়া?

এইজন্যও আমি নগর-কীর্ত্তনকে অত প্রাধান্য দিয়া থাকি। নগর-সঙ্কীর্ত্তন রাস্তায় রাস্তায় হৈ-হুল্লোড় করিয়া দলবদ্ধভাবে বেড়াইবার নামান্তর নহে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, নিদ্রিতকে জাগাইব, নিজেদেরও ঘুম ভাঙ্গাইব। দূরের মানুষকে নিকট করিব, পরকে আপন করিয়া লইয়া বক্ষে ধারণ করিব। হরিনামের অমিত মধু পথে ঘাটে ছড়াইয়া সকলের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে পরিতৃপ্তির প্রাচুর্য্য ঘটাইব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৩ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। অশ্বিনী, সন্ধিনী, যোনি প্রভৃতি মুদ্রা বৃদ্ধ বয়সেও অভ্যাস করা যায়। তবে মাত্রাটা সহাইয়া সহাইয়া বাড়ান উচিত। বৃদ্ধ বয়সে কোন কিছু অতিরিক্তকরা সঙ্গত নহে।

চতুর্দ্দিকে যাহার সংস্পর্শে আস, সকলের মনকেই ঈশ্বর-সাধনে অনুরাগী করিবার চেষ্টা করিও। নিজের মন হইতে গুরুগিরির ভাব দূর করিয়া দিয়া কাজ করিতে পারিলে পরোপদেশে আত্মকল্যাণলাভ অসম্ভব নহে।

তুমি তোমার মন সন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যজাতিগুলির মধ্যে সন্নিবদ্ধ করিয়াছ। ইহা অতি উত্তম কার্য্য। কিন্তু চতুর্দ্দিকস্থ সমতলবাসী শিক্ষাভিমানী জনসাধারণের ভিতরে যে কাজ করিবার প্রয়োজন আছে, তাহা ভুলিয়া যাইও না। আত্মাভিমান ইহাদিগকে অন্ধ করিয়াছে। ভগবন্নামে রুচি-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া ইহাদের মোহ-তিমির অপসারণ কর।

তোমার রচিত গানটী পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। এইসব গান গাহিয়া সকলকে শুনাইও। প্রাণভরা প্রেম লইয়া গাহিলে একটা গানে পাঁচটা বক্তৃতার কাজ হইয়া যায়। ভগবানে অকপট প্রেম এবং অকুণ্ঠ নির্ভর লইয়া যখন যাহা করিবে, তাহাই শুভপ্রসূ হইবে জানিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৩ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্র

পাইয়া সুখী হইয়াছি। সঙ্গীতের যাহা শক্তি, বাগ্মিতার তাহা নহে। বাগ্মী অবুঝকে বুঝ দিতে পারেন কিন্তু সঙ্গীত নিষ্প্রাণকে প্রাণ দিতে পারে। সঙ্গীতে শক্তি বেশী। এই কারণে সৎসঙ্গীতের প্রচার-বৃদ্ধির জন্য সকলের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

তুমিও সেই প্রস্তাবই করিয়াছ।

সৎসঙ্গীতের প্রতি জনসাধারণের রুচি নাই, একথা ঠিক নহে। সিদ্ধকণ্ঠ গায়কেরা বর্ত্তমানে সৎসঙ্গীত কম গাহেন। এই কারণেই তরল এবং ভেজাল গান জনসাধারণ্যে প্রচার পাইতেছে। অধিকাংশ লোকে গানের সুর ভাল লাগিলে পদের ভালমন্দ বিচার না করিয়া গানটা শিখিয়া ফেলে। বারংবার গাহিতে গাহিতে আস্তে আস্তে পদের অর্থ-ভাবনা জন্মিতে থাকে। সঙ্গীত তখন হইতে তাহার শুভ বা অশুভ ফল বিস্তার সুরু করে।

এই কারণেই সৎসঙ্গীত-প্রচার-আন্দোলনে সুরকার, গায়ক এবং শ্রোতার সমান সহযোগ প্রয়োজন।

আমি ত' বাবা আশৈশব লাঙ্গল ঠেলিতেছি, কোদাল মারিতেছি। সুকুমার শিল্প লইয়া, কাব্য-সাহিত্য-দর্শন লইয়া কোনদিনই দুদণ্ডের জন্য বসিতে পারি নাই। হাটে, মাঠে, ঘাটে চলিতে বসিতে হয়ত কখনও গান গাহিয়া ফেলিয়াছি বা উহা লিখিয়া রাখিয়াছি। আমার মতন কর্ম্মব্যস্ত লোকের সৎসঙ্গীত প্রচারের আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ কঠিন।

কিন্তু কথাটা তোমাদের মনে জাগিয়াছে। তোমরা অবিলম্বে কাজটায় হাত দিতে পার। তোমাদের মধ্যে কণ্ঠবান এবং ভাবুক

লোকের অভাব নাই। সুতরাং চেষ্টায় নামিলে অসফল হইবার কিছু কারণ নাই। যতক্ষণ প্রেমের পুঁজিতে ঘাট্‌তি না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য দিক্ দিয়া তোমাদের যোগ্যতা কম থাকিলেও উহা তোমাদের অসাফল্যের হেতু হইবে না। সুতরাং কাজে লাগিয়া যাও।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৩ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। এক এক বংশে মানুষ বেশী বাঁচে, এক এক বংশে কম। কিন্তু এই বাঁচাবাঁচির মধ্যে জীবনের সার্থকতা নাই। যে কয়দিন যে বাঁচে, সেই কয়দিন সে যদি বাঁচার মতন বাঁচিতে পারে, তবেই জীবন সার্থক। মানুষের মত মানুষ দীর্ঘায়ু হইলে জগতের তাহাতে লাভ। অরবিন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধ, জীন, মহাবীর প্রভৃতি প্রত্যেকে দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাঁহাদের দীর্ঘজীবন জগতের কাজে আসিয়াছে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের মহর্ষি কার্ভে জীবদ্দশায় শতবর্ষ অতিক্রম করিলেন। কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, বিবেকানন্দ প্রভৃতি অল্প বয়সে দেহ রাখিয়াছেন। তাঁহাদের এই স্বল্পায়ুতা সত্ত্বেও তাঁহারা প্রতিজনে জগজ্জয়ী মহাপুরুষ।

সুতরাং মানুষের জীবনকে তাহার আয়ুর দিক দিয়া বিচার না করিয়া তাহার বাস্তব সার্থকতার দিক দিয়া বিচার কর।

তুমি তোমার মাতৃদেবীর দীর্ঘায়ু চাহিয়াছ। আমি সেই আশীর্ব্বাদ তাঁহাকে করিতেছি। কিন্তু দীর্ঘায়ুর আশীর্ব্বাদ তিনি নাও যদি পাইতেন, তথাপি ক্ষতির কিছু ছিল না। আজ তোমাদের ওখানে কত লোকে হরিকথা কয়, কত লোকে হরিনাম গায়, তাহার মূলে কি তোমার ধর্ম্মপ্রাণা মাতাটী ছিলেন না? তোমাদের ওখানে যখনই গিয়াছি, মানুষের ভগভদ্ভক্তির দিকটা তখনই আমার চক্ষে অপরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। অনেকেই এই অপূর্ব্ব সম্পদলাভ করিয়াছেন তোমার মায়ের দৃষ্টান্ত এবং প্রেরণা হইতে।

এখনও তাঁহার অনেক কাজ রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি দীর্ঘায়ু হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি!

তুমি তোমার নিজের জীবনকে অনুধাবন কর। এত বড় একটা কষ্টকর অসুখে আজ সাত বৎসর ধরিয়া ভুগিতেছ। একবারটী তুমি আরোগ্য প্রার্থনা কর নাই। কেবলই বলিয়াছ, "আমি যেন রোগের যন্ত্রণায় ভগবানের নাম ক্ষণকালের জন্যও না ভুলি।" স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপনে অক্ষম হইয়া পঙ্গু জীবন যাপন করিতেছ। হাঁটিতে পার না, চলিতে পার না, তবু ত' কোনও ভাগবত অনুষ্ঠানে কেহ তোমাকে অনুপস্থিত দেখে নাই। এমন নিষ্ঠা এবং অনুরাগ তুমি কোথায় পাইলে? সে কি তোমার মায়ের কাছ হইতেই নয়?

একটি মানুষকেও যে জন ভগন্মুখ করিতে পারিয়াছেন, তিনি ঐ একটি কার্য্যের দ্বারাই শতবর্ষ বাঁচিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে হইবে।

তোমার মাতা নিজ সুকীর্ত্তির দ্বারা শত শত বৎসর বাঁচিয়া রহিয়াছেন, এই কথাটি বিশ্বাস কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৩ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

চারিদিকে কুলীর বস্তি আর দরিদ্রের পল্লী, ইহাই তোমার পরিবেশ। প্রত্যহ মুখ দেখ একশ' দেড়শ' মোটর-ড্রাইভারের, ইহাই তোমার সংসর্গ। যে কয়টি লোক তোমার গৃহের সন্নিকটে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে, সকলেই তোমার মত ছিন্নমূল দেশত্যাগী ও অব্যবস্থিত জীবিকার লোক। এমন জায়গায় বসিয়া থাকিয়া কাহারও প্রাণে সমাজ-সেবার উচ্চ প্রেরণা না জাগাই বরং অস্বাভাবিক। ইহারা প্রত্যেকে কোনও না কোনও দিক দিয়া অভাবী। যার যা অভাব, তার তা দূর করারই নাম সেবা।

তুমি অবিলম্বে সেবা-কার্য্য সুরু করিয়া দাও। ভাবিও না যে, তুমি ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটক পড়িয়া কেবল ত্রাহি ত্রাহি করিতেছ। বরং মনে মনে বিশ্বাস কর যে, তোমার দ্বারা জনসমাজের কোনও মহতী সেবা শ্রীভগবান সম্পাদন করাইয়া লইতে চাহেন বলিয়াই তিনি দয়া করিয়া তোমাকে ওখানে পাঠাইয়াছেন।

তুমি শ্রীভগবানের অভিপ্রেত এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সুরু করিয়া দাও। একটী একটী করিয়া প্রত্যেকটী মানবাত্মার সমক্ষে গিয়া তুমি হাজির হও। প্রত্যেককে ডাকিয়া বল, সে নিষ্কল নিরঞ্জন ব্রহ্ম, সে যেন আর দুনিয়ার জঞ্জাল গায়ে মাখিয়া মাখিয়া তার দেবজনোচিত সুন্দর দেহ-মনকে নারকীয় নরপশুর আকৃতি না দেয়। গরীব চাষী, নিষ্কিঞ্চন কুলী, নীতিজ্ঞানহীন উদ্‌ভ্রান্ত মোটর-চালক সকলকেই ডাকিয়া সুধামাখা কণ্ঠে এই কথাটী শোনাও,—তোমরা প্রত্যেকে ব্রহ্ম, তোমাদের ভিতর দিয়া ব্রহ্মশক্তির বিকাশ আজ প্রয়োজন, নিজেদিগকে তোমরা ক্ষুদ্র বলিয়া হীন বলিয়া আর ভাবিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মন্দির আদি প্রতিষ্ঠা কখনও কখনও ধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ, কখনও বা কীর্ত্তি-লোভের লক্ষণ। অন্য পাঁচটা সৎকাজ অপেক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠায় সুনাম সহজে হয়। কুমিল্লার দানবীর মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দরিদ্র ছাত্রদের বিদ্যার্জ্জনের সহায়তার্থে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন কিম্বা চাঁদপুরের হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় অতিথি-সেবার জন্য

যাহা করিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধাংশ ব্যয়ে সাত শত ফিট উঁচু একটা করিয়া মন্দির নির্ম্মাণ সম্ভব হইত। তাহা দেখিবার জন্য তিন শত বা পাঁচ শত বৎসর পর্য্যন্ত ধারাবাহিক লোক-সমাগম কিছু অসম্ভাবনীয় ব্যাপার হইত না। কিন্তু তাঁহারা মন্দির গড়েন নাই। তাঁহাদের সেবাবুদ্ধি পরিচালিত হইয়াছে তাঁহাদের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী অন্য সৎকর্ম্মে। যশোলোভে হইলে হয়ত তাঁহারা আগেই করিতেন মন্দির নির্ম্মাণ।

কিন্তু এক একটা দেবমন্দিরকে উপলক্ষ্য করিয়া ভারতে এবং ভারতের বাহিরে বহু দেশে অনেক মুমুক্ষুর প্রাণে ভগবদ্ভক্তির আরতির বাতি জ্বলিয়াছে। সুতরাং মন্দিরের প্রয়োজন উপেক্ষণীয় নহে। বলিতে কি, মন্দির বা মন্দিরের স্থলাভিষিক্ত ক্ষুদ্র-বৃহৎ উপাসনা-গৃহগুলি অধিকাংশ দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল বনিয়াদ গড়িয়াছে।

মন্দির তুমি গড়িতে চাহ, গড়। কিন্তু তাহাকে সর্ব্বজনের মিলনের ক্ষেত্ররূপেই গড়িতে চেষ্টা করিও। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় কর। কিন্তু যে বিগ্রহে সর্ব্ববিগ্রহ বিরাজিত, তাহাই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সঙ্গত। যেখানে বিগ্রহ বসাইবে, সেখানে বিগ্রহ-বেদীর নীচে তোমার কোনও প্রিয়জনের চিতাভস্ম প্রোথিত রাখিতে চাহিয়াছ জানিয়া তোমার অন্তরের প্রীতির পরিচয় পাইলাম। তবে মন্দিরে চিতাভস্ম প্রোথিত করিলে তোমার বংশের বাহিরের লোকেরা এখানে পূজা উপাসনাদি করিতে মনে কোনও কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করিবেন কিনা, ইহা ত' আমি জানি না। সাধারণতঃ ত্রিলোক-পাবন লোক-গুরুদের শেষাবশেষ মন্দিরে প্রোথিত হইলে সর্ব্বসাধারণ সেখানে

পূজা উপাসনাদির জন্য আসিয়া থাকেন। কিন্তু তোমার পারিবারিক ব্যাপারে জনসাধারণ কি মনোভাব অবলম্বন করিবেন, তাহা ত' বলা যায় না। সুতরাং এই বিষয়টা তুমি তোমার পরিজনবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির নিশ্চয় করিও। শ্মশানে অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত থাকে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট বংশের লোকেরা ছাড়া আর কেহ সেখানে পূজা করিতে যায় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। সকলকে স্নেহ ও আশিস জানাইও।

আমি একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে সঙ্কল্পের কোনও সুস্থিরতা নাই। কোনও কাজেই তোমরা দৃঢ় হইয়া লাগিতে পার না। ভাল কাজের কথা শুনিলে সাগ্রহে অগ্রসর হও কিন্তু শক্ত হাতে কাজ ধরিয়া রাখ না। ইহার কারণ কি তোমরা অনুসন্ধান করিবে?

আমি কখনও তোমাদের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে মনোযোগী হই নাই। তবু তোমরা কোন কোন স্থানে সংখ্যা-গরিমায় যে কোনও ধর্ম্মসংঘের

ঈর্ষ্যার কারণ হইয়াছ। সোনামুড়ার শচীন্দ্র চক্রবর্ত্তী একুশ বৎসর আমার সঙ্গ করিয়াছে। ইন্দাসের রণধীর সিংহ দেও বার বৎসর আমার সহিত যোগাযোগ করিয়াছে। একদিন ডাকিয়া বলি নাই, দীক্ষা নাও। শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধনের প্রতি আমার ব্যক্তিগত আগ্রহের এত অভাব। তবু তোমরা শত শত লোকে দীক্ষিত হইতেছ, স্বেচ্ছায় দীক্ষাগৃহ পূর্ণ করিতেছ। তোমাদের সংখ্যা এক এক জায়গায় যে-কোনও সংঘের তুলনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেই সকল স্থানে তোমরা ইচ্ছা করিলে তুচ্ছ তুচ্ছ সহযোগ দিয়া সমাজ-সেবায় কত অঘটন ঘটাইতে পার। প্রাণ তোমাদের আছে। তোমাদের হৃদয়ের পরিচয় প্রতিপদেই পাই। কিন্তু লাগিয়া থাক না, ইহার কারণ কি?

আমার মনে হয়, তোমরা ব্রহ্মচর্য্য-পালনে অবহেলা করিতেছ। এক সপ্তাহ ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিলে যে শক্তি আসে, এক মণ দুধ খাইলে তাহা আসে না। এক মাস ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিলে যে আনন্দ আসে, একশ' পালা থিয়েটার দেখিলে সে আনন্দ আসে না। বিবাহিত ও অবিবাহিত নির্ব্বিশেষে তোমাদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের বল কমিয়া যাইতেছে। যেই ব্রহ্মচর্য্য তোমাদের ধর্ম্মের মেরুদণ্ড, তাহার প্রতি আনুগত্য তোমাদের তরল হইতে তরলতর হইতেছে।

এই কারণেই বিলাস-ব্যসনে দশ টাকা ব্যয় করিতে পার, দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে দশ পয়সা আলাদা করিয়া রাখিতে রুচি বোধ কর না। ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য গলাগলি করিয়া চলে। একটা আর একটাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। আবাল্য ব্রহ্মচারীর নিকটে

তোমরা মন্ত্র-দীক্ষা নিয়াছ। আমি কি এই প্রত্যাশা করিব না যে, তোমরা প্রত্যেকে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের জন্য অধিকতর মনোযোগী হও?

পালনের চেষ্টা করিলে কিন্তু সংস্কার-দোষে বিফল হইবে, ইহাও উপেক্ষণীয় নহে। ইহাতেও বল বাড়ে। পরীক্ষা দিলে কিন্তু ফেল করিলে, ইহাতেও জ্ঞান বাড়ে। আমার মৌনকালে আড়াই বৎসর ধরিয়া যেই দম্পতিরা কঠোর সংযম-ব্রত পালন করিল, আজ তাহারা প্রায় সকলেই হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। তাই তাহাদের ভিতর হইতে ত্যাগ ও সেবা-বুদ্ধি দূর হইয়া গিয়াছে। তোমরা এক সুদুর্ল্লভ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলে। কেন তোমরা তোমাদের পুরাতন ব্রত ও নিষ্ঠায় ফিরিয়া যাইবে না? কেন আমি তোমাদের নিকটে তেজ ও বীর্য্য প্রত্যাশা করিব না? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার শরীরের উপর গুরুতর চোট কিছু নিও না। আরোগ্য-লাভে দুশ্চিন্তা-দমন ও বিশ্রাম এই দুইটী জিনিষ একান্ত আবশ্যকীয়। আধুনিক যুগে মানুষের অধিকাংশ রোগের সৃষ্টি দুশ্চিন্তা হইতে। কিন্তু ছোট-বড় সর্ব্ব বিষয়ে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর রাখিয়া কাজ করিলে এবং

তাঁহাতে অফুরন্ত বিশ্বাস রাখিলে অনুকূল ও প্রতিকূল সর্ব্ববিধ অবস্থাতেই দুশ্চিন্তা দূর হইয়া যায়।

সম্প্রতি তোমাদের অঞ্চলে বিদ্রোহী নাগাদের উৎপাত হইয়া গেল। ইহাতে তোমাদের মণ্ডলীর অনেক কর্ম্মীর কর্ম্মোদ্যম স্তিমিত হইবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ সর্ব্বপ্রকার উদ্যম হইতে ক্ষান্ত হইবার একটা সুন্দর ওজুহাতও ইহা হইতে পাইবে। কিন্তু সকলকে বলিও যে, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। বিপদের ভয় আছে বলিয়াই আমরা কর্ত্তব্য করিব না, ইহা হইতে পারে না। কাজ করিবেই বলিয়া যাঁহাদের ঝোঁক, তাহারা চতুর্দ্দিকের পরিস্থিতি বিবেচনায় আপাততঃ কর্ম্মে নিবৃত্ত হইয়াও ভবিষ্যতের জন্য অনেক আয়োজন সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়।

তোমাদের ওখানে যে একটি দুইটি কর্ম্মীর কর্ম্মোদ্যম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহাদের ডাকিয়া বলিও যে সাময়িক বাধা-বিঘ্ন দেখিয়া কাহারও হতাশ হওয়া উচিত নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টারও অনেক বৃহৎ পরিণতি ঘটিয়া থাকে, যদি চেষ্টা হয় অবিরল ও অবিচ্ছেদ। নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্ম-তালিকা লইয়া প্রত্যেকে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যটুকুই করুক।

কোন এক মঠের ধর্ম্মাচার্য্য মহোদয় তোমাদের অঞ্চলে আসিবেন বলিয়া তোমরা কেহ কেহ যেন ভয়ার্ত্ত হইয়াই আমাকে ডাকিয়াছিলে। আমি তোমাদের ভয়ের প্রকৃত কারণ অনুধাবন করিতে পারিলাম না। কোন মঠ বা আশ্রম হইতে কোনও সাধু-মহাত্মা আসিলে নিশ্চয়ই তিনি জনসাধারণকে ঈশ্বরনিষ্ঠ করিবার জন্য চেষ্টা পাইবেন। ইহাতে

আমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি কি আছে? সকলের কথা ত' সকলে শুনে না। যে সকল লোক আমাদের কথা শুনিত না, তাহারা হয়ত এই ধর্ম্মাচার্য্যের কথায় পথে আসিবে। ইহা আমাদের সর্ব্বজনীন লাভ। লাভের ব্যাপারকে ক্ষতির কারণ বলিয়া কল্পনা তোমরা কেন করিতেছ?

এমন কতকগুলি লোকও আছে, যাহাদের নিকটে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাচার্য্যেরা গিয়া উপস্থিত হইলেও, একবার তাহারা ঈশ্বরের নাম লইবে না। এস না আমরা বরং সেই লোকগুলির ভিতরে কাজ করিবার চেষ্টা দেখি। সুন্দর, সমতল, নদীমাতৃক, শস্যদ স্থানগুলিতে সকলেই লাঙ্গল চালাইয়া দিয়াছেন। যেখানে পলে পলে লাঙ্গল ভাঙ্গে, মিনিটে মিনিটে কোদালে গাইতে পাথর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে, চল না, আমরা সেখানকার পাথর কাঁকড় ভাঙ্গিতে সচেষ্ট হই। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাচার্য্যদিগকে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিবার কি প্রয়োজন আছে?

আমার দুইজন শিষ্য হয়ত তোবা তোবা করিয়া মহামন্ত্র ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া আধ্যাত্মিক পিপাসার পরিতৃপ্তি চাহিয়াছে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহাতেই বা তোমাদের বুদ্ধি-বিভ্রমের প্রয়োজন কি? যে যেখানে নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন করিতে পারিবে, তাহার সেখানেই আশ্রয় নেওয়া উচিত। ইহাদিগকে দলত্যাগী বলিয়া গালি না দিয়া বরং পরমেশ্বরের নিকট ইহাদের জন্য আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা কর। ইহাদের সুখ হউক, ইহাদের শান্তি হউক। সব সংঘেই এরূপ দু-পাঁচ-দশ জন দলত্যাগী থাকে। তাহাদের প্রতি বিরোধ-ভাব পোষণ করিবার মধ্যে কোনও সার্থকতা নাই।

সকল ধর্ম্মাচার্য্যদেরই নিজ নিজ ব্যক্তিগত কতকগুলি খোশ-খেয়াল থাকে। কেহ ব্রাহ্মণ ছাড়া দীক্ষা দিবেন না। কেহ ধনী শিষ্য পাইলেই খুশী হইবেন। কেহ কেহ বুছিয়া বাছিয়া আয়কর-অফিসারদের দীক্ষা দেবেন। কেননা, ইহাতে সমস্ত ব্যবসায়ি-মণ্ডলী এক দাওয়াইতে বশ হইয়া যাইবে। কেহ কেহ দীক্ষিতব্যকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইবেন যে আমৃত্যু প্রত্যহ গুরুদেবের জন্য অর্থসঞ্চয় করিতে হইবে। এইরূপ কতরকমের খোশ-খেয়ালী কত ধর্ম্মাচার্য্যেরা আছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তোমাদের ত' সেই সকল বালাই কিছুই নাই। গরীব হইলেও তোমাদের এখানে দীক্ষা পাইতে কোনও বাধা নাই, নীচ জাতি হইলেও কোনও আপত্তি নাই, বড় বড় সরকারী চাক্‌রি-নক্‌রি না করিলেও দীক্ষাকালে সে সমাদরণীয়, গুরুদেবকে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক বা বার্ষিক রজত-কাঞ্চন দক্ষিণা দানেরও কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। এই একটা জরুরী জায়গায় যখন প্রায় সকলের সঙ্গে তোমাদের এক বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে, তখন তোমরা কোনও ধর্ম্মসংঘকেই তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়া পরিক্লিষ্ট হইতে পার না। তবে একটি জায়গাতে তোমাদের অবশ্যই উদ্বিগ্ন হইবার সঙ্গত যুক্তি আছে। তাহা হইতেছে তোমাদের নিজেদের নিষ্ঠা এবং অনিষ্ঠা।

কোনও স্থানে তোমরা দুইজন আছ, কোনও স্থানে বা আছ দুইশ'। যেখানে দুইজন আছ, সেখানেও সমবেত উপাসনায় দুইজনের বেশী আস না, যেখানে দুইশ' আছ, সেখানে টানাটানি করিয়া আস

বড় জোর দশজন। অথচ তোমাদের সমবেত উপাসনা এক অসাধারণ অসাম্প্রদায়িক ব্যাপার। কেন ইহাতে বাহিরের শত শত নরনারী যোগদান করিতে আগ্রহী হইবেন না? সেই প্রশ্নের জবাব শুধু এই যে, তোমাদের নিজেদেরই নিষ্ঠা কম। নিজের সাধনার প্রতি নিজে নিষ্ঠাশীল হইলে অপরেও শ্রদ্ধাবান হয়। অখণ্ড মন্ত্র পাইয়া তোমরা হইবে বিশ্বের মানুষ—একটা নির্দ্দিষ্ট সংঘ, সম্প্রদায় বা দেশের মানুষ নহে। তোমাদের উপাসনা হইতেছে বিশ্বদেবতার উপাসনা—কোনও নির্দ্দিষ্ট তন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট দেবতার উপাসনা নহে। সমবেত উপাসনাকালে তোমরা শ্রীগুরু-স্মরণ কর—কিন্তু সে গুরু বিশ্বগুরু। নির্দ্দিষ্ট কোনও সীমাবদ্ধ দেহধারী গুরুর প্রতিচিত্র সেখানে স্থাপিত হইতেছে না। সগোত্র বিগোত্র সকলকে লইয়া উপাসনার রাস্তা খোলা রহিয়াছে যেখানে, সেখানে সমসঙ্গী তোমরাই অতি অল্প কয়জনে মিলিত হইতেছ। আমি ত' মনে করি, ভয়ের কারণ থাকিলে এইখানেই আছে। তোমরা এই আসল ভয়কে দূর কর।

পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাচার্য্যদের সম্পর্কে আমাদের মন উন্মুক্ত। প্রত্যেককে আমরা সম্মান করিব, প্রত্যেকের ধর্ম্মোপদেশ আমরা শ্রদ্ধা সহকারে শুনিব, প্রত্যেকের শিষ্যদিগকে আমরা ভ্রাতা বলিয়া গণ্য করিব। কেবল সাধনার বেলা আমরা অব্যভিচারী থাকিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মাত্র একটা লোক তোমাদের অঞ্চল হইতে সরিয়া দূরে গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের স্থানীয় সঙ্ঘটির প্রাণের স্পন্দন কমিয়া গিয়াছে। ইহা শুভ লক্ষণ নহে।

সকল স্থানেই দুই একটি কর্ম্মীর উৎসাহ-উদ্দীপনা কিছু বেশী থাকে। কিন্তু তাহাদের উৎসাহাধিক্য অপরাপরের ভিতরে কর্ম্মপ্রেরণা সৃজন করিয়া থাকে। ফলে একটি লোক অসুস্থ হইলে বা দূরে গেলে সংঘের কাজ অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে। তোমাদের ওখানে কেন তাহা হইতেছে না? তোমাদের জেলার একটা শ্রেষ্ঠ মণ্ডলী হঠাৎ পিছনে পড়িয়া গেল কেন?

অবিলম্বে সকলকে লইয়া পরামর্শ করিতে বস। অবিলম্বে প্রতিকার করিবার রাস্তা খুঁজিয়া বাহির কর। তোমাদের যে নিজেদের প্রতি এবং সর্ব্বসাধারণের প্রতি সুবিপুল কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা প্রতিজনে স্মরণ কর। পরস্পর পরস্পরের দোষানুসন্ধান করিয়া দুর্ব্বল হইও না। কাহার ভিতরে কোন্ গুণটুকু আছে, খুঁজিয়া বাহির করিয়া সবল হইবার পথ নির্ম্মাণ কর। যাহার যেটুকু সদ্‌গুণ ও যোগ্যতা আছে, সর্ব্বজনের সেবায় সে তাহাকে প্রয়োগ কর।

একটি সভাধিবেশন করিতে হইলে সংগঠক কর্ম্মী নিয়া আসিতে

হইবে বার মাইল দূর হইতে, একটি কীর্ত্তনানুষ্ঠান করিতে হইলে বত্রিশ মাইল দূর হইতে আনাইতে হইবে কীর্ত্তন-পরিচালককে,—ইহাই তোমাদের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। তোমাদের নিজেদের ভিতরে গুণী রহিয়াছ অনেক। কিন্তু অনুশীলনের অভাবে সে গুণ ছাই-চাপা পড়িয়া আছে। তোমাদের দুই একজন প্রধান নেতা এতই বৃথা-বাক্য-পরায়ণ যে, তাহাদের নির্দ্দেশের মূল্য কমিয়া গিয়াছে। শক্তিহীন নির্দ্দেশ-বাণী কেহ ত' পালন করে না। বহু-বাক্য-পরায়ণের নির্দ্দেশে শক্তি থাকে না।

নিকটবর্ত্তী বাস্তুহারা উপনিবেশগুলির মধ্যে তোমরা প্রবেশই কর নাই। অথবা যেখানে যেটুকু প্রবেশ করিয়াছ, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। আমি নিজে যদি না ইহাদের মধ্যে ঘুরিয়া আসিতাম, তাহা হইলে অনুমানই করিতে পরিতাম না যে, পুর্ব্ববঙ্গ হইতে আমার এতগুলি সন্তান আসিয়া এই সকল অস্থায়ী শিবিরে মাথা গুঁজিয়াছে। ধনের প্রত্যাশা লইয়া নহে, প্রেমের পসরা লইয়া ইহাদের নিকটে তোমাদের যাইতে হইবে। এতদিন ইহারা নিজেদিগকে একান্তই একাকী ও অসহায় বলিয়া জ্ঞান করিতেছিল। উদ্বাস্তু-শিবিরের মধ্য দিয়া আমার পথাতিক্রম করিবার কালে আমাকে দেখিয়া ইহারা হাতে স্বর্গ পাইয়াছে। তোমরা ইহাদের সহিত অন্তরের যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ইহাদের দুঃখের মরুভূমিকে স্থায়ী অমরাবতীতে পরিণত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। অনেক বৎসর আগে তোমাদের সহরে গিয়াছিলাম। হরিসভাতে সাত দিন ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলাম। প্রথম দুইদিন মুষ্টিমেয় লোক হইয়াছিল। শেষের কয়দিন হলে কুলায় নাই, মাঠে নামিতে হইয়াছিল এবং চারিদিকের গাছের ডালে পর্য্যন্ত মানুষের ভিড় দেখা গিয়াছিল। এখনও সহরের অনেক বৃদ্ধ আমার নাম করিলে চিনিতে পারিবেন।

এমন একটা সহরের মধ্যে এবং তাহার উপকণ্ঠে তোমরা কমপক্ষে জনা ত্রিশেক ঢাকা, বরিশাল, ত্রিপুরা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে আসিয়া গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়াছ। এতদিনের মধ্যেও তোমাদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় স্থাপিত হইল না জানিয়া উদ্বেগ বোধ করিতেছি। সকলে একই মন্ত্রে দীক্ষিত, তবু তোমরা একজন আর একজনকে চিনিতে পারিলে না? চিনিলে আত্মীয়তা হইত। পরস্পরের মিলনের মধ্য দিয়া অন্তরের বল বাড়িত।

বলিতে পার, বাহির হইতে চিনিবার মত কোনও সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণের বিধি তোমাদিগকে দেই নাই। ভ্রূমধ্যে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা অনেকে বিনা কারণেও দিয়া থাকে। সুতরাং এক অখণ্ড অপর অখণ্ডকে চিনিবে কি করিয়া?

কিন্তু মূলে ভুল করিয়াছ। যাহারা সাধন করে, তাহাদের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি পরস্পরকে সন্নিহিত করিয়া দেয়। তোমরা যদি সাধন করিতে, তাহা হইলে একটা সহরে তিন বৎসর বাস করিয়াও পরস্পরের নিকট অপরিচিত থাকিতে না। দীক্ষা নিয়াছ, সাধন কর না। অর্থাৎ জমি কিনিয়াছ, চাষ কর না। সমস্ত জমি জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, আগাছা আর কণ্টক-বনে শ্যামল শস্যক্ষেত্র এক দুর্ভেদ্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে।

খুঁজিয়া তোমার গুরুভ্রাতাদিগকে বাহির কর। তাহাদের প্রত্যেককে বল যে তোমাদের সাধন করিতে হইবে। আমরা অমুকের শিষ্য আর অমুক আমাদের গুরু, এইরূপ অলস জল্পনায় চলিবে না। দীক্ষা নিলেই কেহ গুরু বা শিষ্য হইয়া যায় না,—সাধন করিতে হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

গুরু এবং শিষ্যের সম্বন্ধ এমন পবিত্র যে, ইহাকে ব্যক্তিগত স্বার্থের স্পর্শের দ্বারা কলঙ্কিত করা অন্যায়। এই কারণেই অধিকাংশ

লোক-গুরু শিষ্যদের নিকট অর্থ প্রার্থনা করেন না।

শিখদের আদিগুরু নানক সম্পর্কেও এই কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু পরবর্ত্তী গুরুরা দেখিলেন যে, সংঘের প্রয়োজনে অর্থের আবশ্যকতা আছে। সেই অর্থ জনকল্যাণে ব্যয়িত হইবে বলিয়া গুরুদেবের হস্তে পৌঁছিলেও গুরুদেবের ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত একেবারেই সম্পর্কহীন। কালক্রমে শিখ সমাজে এই অর্থদানটি এমন একটি বদ্ধমূল রীতিতে পরিণত হইল যে, মোগল রাজ-সরকার ইহাকে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ-সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজার ন্যায় বার্ষিক খাজনা আদায় বলিয়া কুব্যাখ্যাও করিতে বিরত হন নাই।

মোট কথা, সংঘ গড়িলে সংঘের প্রয়োজনে অর্থের আবশ্যকতা আছে।

কিন্তু আমি তোমাদিগকে সংঘের প্রয়োজনে আর্থিক ত্যাগ স্বীকার সম্পর্কে সচেতন করিতে প্রয়াসী হই নাই। আমি যাহা চাহিয়াছি, তাহা হইতেছে তোমাদের আধ্যাত্মিক রাজস্ব। তোমরা সমবেত উপাসনায় প্রত্যেকে যোগদান কর এবং যেভাবে যোগদান করিলে সত্য সত্য যোগদান করিয়াছ বলিয়া অন্তরে উপলব্ধি পাইবে, তেমন ভাবে সর্ব্বকার্য্য কর। উপাসনায় আসিবে, খালি হাতে আসিও না। উপাসনায় বসিবে, অশুচি অবস্থায় বসিও না। কেহ ফুল, কেহ বিল্বপত্র, কেহ তুলসী, কেহ চন্দন, কেহ ভোগ-নৈবেদ্য, কেহ অন্যান্য উপকরণ নিজ সাধ্যমত পরিমাণে অবশ্যই আনিবে। উপাসনায় যোগ দিবে, আর পাঁচটি সদ্‌ভাবের ভাবুক, ভগবৎ-প্রেমিক, অদোষদর্শী, বিনয়-নম্র-স্বভাব সজ্জনকে সঙ্গে লইয়া আসিবে। তোমাদের উপাসনা

ত' কোন সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান নহে যে, তোমার গুরুভাই না হইলে প্রবেশ নিষেধ!

আমি তোমাদের নিকটে অর্থ চাহি নাই। তাই বলিয়া এইটুকুও কি চাহিব না?

দীক্ষা নিলেই সর্ব্বকার্য্য হইয়া গেল, এই যে কুসংস্কার দেশমধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার তোমরা জ্বলন্ত প্রতিবাদ রূপে আত্মপ্রকাশ কর। দীক্ষা নিবার পরে তোমাদিগকে সাধনও করিতে হইবে। নিয়ত যেমন ভগবৎ-স্মরণ করিবে, তেমন নিত্যকার উপাসনাও নিয়মিত করিবে। দৈনিক যেমন ব্যক্তিগত উপাসনা করিবে, তেমন সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতেও যোগ দিবে। এই কাজগুলি তোমাদের করাই চাই। ইহাতে তোমাদের প্রেম বাড়িবে, ভগবানকে আপন করিয়া পাইবে, মানুষকে আপন বলিয়া চিনিবে, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের সহিত মিলিত হইবার অক্ষয় সেতু নির্ম্মিত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

দক্ষিণ কাছাড়ের দুইজন দীক্ষাপ্রাপ্ত রিয়াং ত্রিপুরার বংশুল পাহাড়ে

চলিয়া আসিয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। শ্রীমান মঙ্গলজয় রিয়াং ও শ্রীমান বীরেন্দ্রকুমার রিয়াংকে তাহাদের এই স্থান-পরিবর্ত্তনে অভিনন্দিত করিতেছি। ইহাতে ইহারা কেবল জীবিকার্জ্জনেরই নূতন ক্ষেত্র পাইল তাহা নহে, পার্ব্বত্য-জাতির মধ্যে উন্নয়ন-কার্য্য করিবারও ক্ষেত্র পাইল। আমি বড়ই আনন্দিত যে, সুলতানীছড়ার শ্রীমান চন্দ্রশেখর ভদ্র ইহাদের মধ্যে ঝালনাছড়ায় যে কাজটুকু করিয়া রাখিয়াছিল, সেই কাজটুকুই ইহারা নিজেরা আবার বংশুল পাহাড়ে করিবে। যে আজ ছাত্র, কাল সে শিক্ষক, ইহাই সভ্যতার রীতি। তুমি শ্রীমান মঙ্গলজয় ও শ্রীমান বীরেন্দ্রকুমারকে দিয়া যতটুকু কাজ করাইতে পার, তাহা করাইতে থাক। কাজ করিতে করিতে ইহাদের উৎসাহ সর্ব্বসীমাকে লঙ্ঘন করুক।

ইতঃপূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে কয়েক মাস ব্যাপিয়া ধারাবাহিক ধর্ম্মাভিযান আমরা চালাইয়াছি। তাহাতে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় কোনটাকেই গ্রাহ্যে আনি নাই। আমাদের সংঘ ধনশালী নহে। যে কাজটুকু করিয়াছি, কেবল মনের বলেই করিয়াছি। কিন্তু পার্ব্বত্য খণ্ডজাতিসমূহের ভিতরে ইহার শুভ ফল কোনও কোনও কেন্দ্রে সুবিপুল ভাবে ফলিয়াছে। বিশ্বাসের কথা বলিতেছি না, এ ফল প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। পাহাড়ে পাহাড়ে আজ হরিনাম-কীর্ত্তন শুনা যাইতেছে। বটবৃক্ষ প্রতিষ্ঠায়, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি কাজে কীর্ত্তনদক্ষ হরিনাম-ভক্তদের সর্ব্বাগ্রে খোঁজ পড়িতেছে। এমন একটা জাগরণ কেহ প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু তাহাই হইয়াছে।

এমতাবস্থায় তোমাদের কর্ত্তব্য আরও গুরুতর হইল। আমার

একটা গান আছে—"জাগাইলে যদি হরি, দেহ চির-জাগরণ।" দেখিও ইহারা যেন ঘুমাইয়া না পড়ে। সেই গানটারই আর একটা পদ রহিয়াছে—

"সে জাগা জাগিতে চাই, যাহাতে বিরাম নাই।
সুখে দুখে সদা পাই তোমারি চারু চরণ।"

সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় ইহাদের আধ্যাত্মিক জাগরণকে অটুট অক্ষত অবিচল করিয়া রাখিতে হইবে। ইহারা জাগিয়াছে। যাহারা জাগিয়াছে, তাহারা ভাগ্যবান। আমাদের শ্রম ভগবান বিফল করিয়া দেন নাই—আমরাও ভাগ্যবান। আমাদের কোন পক্ষেরই ভাগ্য যেন আর ম্লান হইতে না পারে। জ্ঞানসূর্য্য একবার যখন উঠিয়াছে, আর তাহাকে অস্তগামী হইতে দিব না।

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার কন্যার সহিত জামাতার বনিবনা হইতেছে না এবং একে অন্যের সংসর্গ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া চলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে শুনিয়া ব্যথিত হইলাম। দম্পতির জীবনে এই অবস্থাটী অত্যন্ত অসহনীয়।

কিন্তু এই অবস্থাটীর কারণ অবগত হইতে পারিলে হয়ত দুই জনের স্থায়ী মিলন-সাধন সুসম্ভব। সেই দিকে একটু সতর্ক লক্ষ্য দিবে কি? মানুষের জীবন যেমন একদিকে অতীব গরীয়ান, অপর দিকে তেমনই প্রতিপদে ভুল-ত্রুটিতে ভরা। একে যখন অপরকে সত্য সত্য ভালবাসে, তখন এই ভুল-ত্রুটি সংশোধনও সহজ, আর এই ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করাও সহজ। সংসারে আত্মসংশোধন ও পরদোষে ক্ষমা নাই বলিয়াই না সংসার এত জটিল, কুটিল, গ্রন্থিল ও কদর্য্য!

কিছু একটা অস্বাচ্ছন্দ্যকর ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে করিয়া বসিয়া থাকিও না যে, সত্য সত্যই জীবনের কল চিরতরে বিগড়াইয়া গিয়াছে। দাম্পত্য জীবনের অধিকাংশ কলহ প্রেমের পিপাসা হইতে উদ্‌ভূত হইয়া থাকে। কতক জন্মে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও চরিত্রের দুর্ব্বলতা হইতে।

প্রকৃত কারণ আগে খুঁজিয়া বাহির কর। প্রতীকার সহজেই সম্ভব হইবে।

অনেক মাতাপিতা নিজ কন্যাকে স্বর্গের দেবী বলিয়া কল্পনা করিয়া অনেক সময়ে অন্যায় প্রশ্রয়, কখনও কখনও অন্যায়ে প্ররোচনা দেয়। কন্যাকে বিনীত, নম্র, ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু হইবার শিক্ষা দিতে পারিলে অনেক পাষাণ স্বামীরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। প্রথম ক'দিন যাহাদের জীবন অসহনীয় অশান্তিতে গিয়াছে, এমন দম্পতিকেও পরবর্ত্তী জীবনে পরম শান্তিতে বাস করিতে দেখা গিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, বাহিরের রুক্ষ্মতার আড়ালেও যে একজন প্রেমিক পুরুষ বা প্রেমিকা নারী ব্যাকুল বিরহ-বেদনা লইয়া মিলনের প্রতীক্ষায়

বসিয়া আছে, ইহা প্রথমে কেহই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। অনেক দুঃখ ও অনেক ব্যথা সহিবার পরে হঠাৎ ইহারা নিজেদিগকে আবিষ্কার করিয়াছে।

সুতরাং ধৈর্য্যহীন হইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এক তামাকের ব্যাপারী অন্য তামাকের দোকানীর কাছ ঘেঁষিয়াই নিজ দোকান খোলে। এক লোহার অন্য লোহারের বাড়ীর কাছ ঘেঁষিয়া নিজের লোহার গুদাম করে। এক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান কেন অন্য ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের ছায়া স্পর্শ করিতে পারে না?

তামাকের ব্যাপারী ও লোহার উভয়েই জানে যে, সমগ্র পৃথিবীর সকল লোককে তামাক বা লোহা যোগাইবার সাধ্য তাহাদের নাই, অতএব নানা জনের নানা দোকান থাকিবেই। পরন্তু ধর্ম্ম-ব্যাপারীরা মনে মনে ধারণা করে যে, একটু চতুরতা, একটু কৌশল অবলম্বন করিতে পারিলে তাহাদেরই দোকান হইতে ত্রিভুবনের সকল ধর্ম্মার্থী নিজ নিজ ধর্ম্মের সওদা ক্রয় করিবে, সুতরাং অন্য ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান জগতের কাছে অপ্রয়োজনীয়।

এই মিথ্যা ধারণা হইতেই ধর্ম্মজগতে এক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অন্য প্রতিষ্ঠানের বিদ্বেষ ও অমিত্রতা।

তোমরা নিজেদিগকে এই অর্ব্বাচীন-সুলভ মিথ্যা ধারণা হইতে মুক্ত রাখিও। তোমরা সকল ধর্ম্মসঙ্ঘকে সমান শ্রদ্ধা দান করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অতি অল্প সময়ের জন্য নগাঁও জেলার অভ্যন্তরে তোমাদের ঐ ক্ষুদ্র স্থানটিতে গিয়াছিলাম। এত অল্প সময়ে তোমরা যে আগ্রহ ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছ, তাহা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু তোমরা যে সমবেত উপাসনায় নিয়মিত উপস্থিত হইতে সমর্থ হইতেছ না বলিয়া সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে ব্যথা বোধ করিতেছি। অল্প সময়ে অসাধ্য কাজ করিবার যাহাদের যোগ্যতা আছে, ধারাবাহিক নিয়মে তাহারা মাসের পর মাস সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটিতে যোগদান করিয়া নিষ্ঠার পরিচয় কেন দিতে সমর্থ হইবে না? হাট বাজারের দিন বাদ দিয়া উপাসনার তারিখ করিলে কেন ইহাতে যোগদানে তোমাদের অবসর হইবে না? সমবেত উপাসনা যে

তোমাদের জ্ঞাত অজ্ঞাত অধিকাংশ সামূহিক বিপত্তির নিরসন করিতে সমর্থ, এই কথাটি তোমরা বিশ্বাস করিও। এই একটি বিশ্বাস আসিলেই দেখিবে যে, সমবেত উপাসনাতে আর ঔদাস্য নাই।

তোমরা অধিকাংশই দরিদ্র। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রদেরই ধর্ম্মবল অধিক। যাহারা পেটের ক্ষুধায় অধীর হইয়া বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে নিষ্ফল আবেদন লইয়া দুয়ারে দুয়ারে এক মুঠা ভাত বা একবাটি ভাতের ফেন পাইবার জন্য ঘুরিয়া মরে, তোমরা তত দরিদ্র নহ। সুতরাং তোমাদের দরিদ্রতা তোমাদের সমবেত উপাসনার একটা অলঙ্ঘনীয় বাধা কিছুতেই হইতে পারে না। উপাসনায় আসিতে ইচ্ছা থাকিলে সহজেই তোমরা সাংসারিক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পার। তবে কেন সমবেত উপাসনাতে কোন সপ্তাহেই দুই এক জন লোক লইয়া কেবল নিয়মরক্ষারই অভিনয় চলিতেছে?

এমন একটি স্থানে তোমাদের ক্ষুদ্র বাজারটি অবস্থিত যে চারিদিক হইতে চারিটী বিভিন্ন-বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন পৃথক অঞ্চলের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ-রক্ষা তোমাদের পক্ষে সহজ। এমন একটি স্থানে প্রাচীন অহম্ রাজারা যে এককালে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা খুব অযুক্তিযুক্ত হয় নাই। আজ অহম্ রাজারা নাই। কিন্তু চারিটী রাস্তার চতুর্দ্দিকে ভাব-সম্প্রসারণের যোগ্যতা লইয়া তোমরা রহিয়াছ। এমন একটি স্থানের স্বাভাবিক সুযোগ কেন তোমরা গ্রহণ করিবে না?

তোমাদের কর্ত্তব্য চারিটী রাস্তা ধরিয়া চৌদিকে দূর-দূরান্তরে প্রচারকার্য্য চালাইয়া যাওয়া। কোথাও পাইবে সমতলবাসী শিক্ষিত বাঙ্গালী। কোথাও পাইবে টীলার উপরে দলে দলে চা-বাগিচার কুলি-বস্তি। কোথাও পাইবে পূর্ব্বতন চা-শ্রমিকদের বারো জাতি মিশ্রিত নূতন রক্তের নূতন চাষ-আবাদ। কোথাও পাইবে সর্ব্বপ্রকার-সভ্যতা-বিরহিত মিকির, লালং, ডিমাছা। একটি জায়গায় থাকিয়া এই চারি রকমের বৈচিত্র্য দেখা ও শুনা একটা সামান্য কৌতূহলজনক ব্যাপার নহে। তোমাদের জানিবার ইচ্ছা এবং কাজ করিবার উদ্যমকে অচিরে সঞ্জীবিত করিতে হইবে এবং চতুর্দ্দিকের এই চারি ভুবন মিলাইয়া এক অখণ্ড সংসার সৃজনের জন্য অগ্রণী হইতে হইবে। অনেক স্থানেই সুকর্ম্মী আছে কিন্তু স্থানের এমন ভৌগোলিক সুযোগ কোথাও নাই। তোমরা এই সুযোগ অবহেলা করিও না।

তবে একটা কথা মনে রাখিও যে, কাজ কিছু করিতে হইলে প্রত্যেককে ব্যক্তিগত জীবনের সাধন-ভজন নিয়মিত করিতে হইবে। আর সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় নিয়মিত যোগদানও করিতে হইবে। এই ভাবে চলিলে তোমাদের অন্তরের শক্তি প্রবর্দ্ধিত হইবে শতগুণ এবং চারিদিকের অচেনা মানুষেরা তোমাদিগকে বিশ্বাস করিবে সহস্র গুণ। যে যাহাকে সেবা করিবে, সে তাহার বিশ্বাস-ভাজন না হইলে সব শ্রম পণ্ড হয়। মুখের চাতুরী বা কথার বহরে অচেনা লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় না। তাহার উপায় হইতেছে, সেবা এবং প্রেম। প্রেম অকপট আর সেবা নিষ্কাম হইলে পাষাণ ফাটিয়া বারিধারা নির্গত হয়, মৃতের মধ্যেও নবজীবনের

সঞ্চার হয়। তোমরা সাধক হও, সেবক হও ও প্রেমিক হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানিও।

তোমার পত্রে অনেকগুলি প্রশ্ন পাইলাম। সকল প্রশ্নেরই জবাব আমি অবসর অনুযায়ী লিখিব। কিন্তু এসকল প্রশ্নের জবাব ত' তুমি তোমার নিজের মন হইতেই পাইতে পারিতে। একখানা কাগজে একখানা প্রশ্ন লিখিয়া তোমার পূজার আসনে রাখিয়া দাও। তারপর বসিয়া পড় নামজপে। দুই চারি দিন জপ করিবার পরে আপনা আপনি প্রশ্নের জবাব তোমার কাছে আসিতে থাকিবে। এক সঙ্গে দুই, চারি, বা দশটী প্রশ্ন করিও না। একটী একটী করিয়া প্রশ্নের এভাবে সমাধান করিও।

অনেক সময়ে প্রশ্ন করা একটা মানসিক ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন এভাবে মানুষের কাছে কেবল প্রশ্রয় পায় এবং মানুষ ভাবিতে বসে যে, জীবনটা বুঝি কতকগুলি দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য প্রশ্নেরই সমষ্টি। কিন্তু শত শত প্রশ্নের উৎপীড়নকে না মানিয়া বাছিয়া বুছিয়া একটী মাত্র প্রশ্নকে নিয়া মনঃস্থির করিতে

পারিলে কিছুদিন মধ্যেই সেই প্রশ্নের জবাব নিজের মনের মাঝ হইতেই আসিয়া যায়। আর, একটী প্রশ্নের জবাব একবার আসিলে পরবর্ত্তী প্রশ্নগুলির জবাব আপনা আপনি সহজ হইয়া থাকে। তখন দেখা যায় যে, মনুষ্য-জীবনটা কেবল প্রশ্নেরই সমষ্টি নহে, ইহা সমাধানেরও সমষ্টি। জীবনটা কেবল সমস্যা নয়, ইহা পরমসত্যের আনন্দোজ্জ্বল সুস্থির স্বীকৃতিও বটে।

মনুষ্য-সমাজে নাস্তিকেরই কেবল সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে, তোমার এই অনুমান সত্য নহে। জন্মমাত্রই মানুষ নাস্তিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদী, প্রত্যক্ষের অতীত কোন সত্যকে স্বীকার করিতে সে কুণ্ঠিত। বয়োবৃদ্ধি ও বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার প্রত্যক্ষ-দর্শনের ক্ষমতা বাড়ে, তেমন আবার অপরাপরের কাছ হইতে জ্ঞান ও ধারণা সমূহ লাভ করিবার সুযোগ ঘটে। এই সময়ে সে প্রতিবেশ-প্রভাব-হেতু এমন অনেক বিষয়কে বিশ্বাস করিতে সুরু করে, যাহার সম্পর্কে তাহার নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। তখন তাহাকে আমরা আস্তিক নাম দেই। কিন্তু নানা স্থান হইতে নানাবিধ ধারণা সংগ্রহ করিতে করিতে এক একটী ধারণার সহিত অন্যান্য ধারণার যুক্তিগত বিরোধ লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সে অবিশ্বাস করিতে সুরু করে, প্রত্যক্ষগুলি ছাড়া অন্যগুলির মূল্য তাহার নিকট কমিয়া যায়। আবার তাহাকে নাম দেওয়া হয় নাস্তিক। কিন্তু অবিশ্রাম অনুসন্ধানের পরে আস্তে আস্তে তার চোখের ঘোর কাটে, অনেক আপাত-বিরুদ্ধ ব্যাপারের মধ্যে সে সামঞ্জস্য দেখিতে পায় এবং ক্রমশঃ সে প্রেমের বলে জ্ঞানকে পায়,

জ্ঞানের বলে প্রেমকে লাভ করে এবং জ্ঞান-প্রেমময়তার প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি তাহাকে সর্ব্বসংশয়মুক্ত করে, সে হয় পূর্ণ বিশ্বাসী। আমরা তাঁহাকে নাম দেই আস্তিকশ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্ত।

সত্যের পথ, আনন্দের পথ, হিংসা-বিদ্বেষ-বর্জ্জিত প্রেমময় পথই তোমাদের পথ। এই কথা মনে রাখিয়া পথ চল। বাহিরের সমালোচনা হইতে বাঁচিবার কল্পনা করিও না। দশ জনের সঙ্গে গতানুগতিক ভাবে যাহারা চলে না, সমালোচকের রুক্ষ্ম রসনা ত' তাহাদের কোনও সময়েই ছাড়িবে না। সমালোচনাকে ভয় করিও না। এমন ভাবে চলিও না, যাহাতে অকারণ সমালোচনার সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু যাহারা নিন্দক, তাহারা ভালকেও নিন্দা করে, মন্দকেও করে। তাহাদের রসনাকে কোনও অবস্থাতেই স্তব্ধ করিতে পারিবে না। এমতাবস্থায় ইচ্ছাপূর্ব্বক সমালোচনার কারণ সৃষ্টি না করিয়া শুচি ও শুদ্ধ মনে জগতের কল্যাণকে স্থির লক্ষ্যে রাখিয়া হিংসা-বিদ্বেষ-বিহীন প্রেমময় স্বভাবের বশে নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে থাক। তার পরে যাহা হইবার, হউক।

উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্রকন্যা পিতা-মাতার কতকগুলি দোষ-গুণ পায়, ইহা সত্য। কিন্তু শিক্ষার দোষ-গুণে সেই সকল বিশিষ্টতার কোনওটা অবিকশিত থাকে, কোনওটা বা প্রস্ফুটিত হয়। শুধু বংশানুক্রম কাহারও জীবনের পক্ষে চূড়ান্ত কথা নহে, নিজের সাধনাও প্রয়োজন। সদ্‌গুণান্বিত পিতামাতার ঘরে জন্মিলেও পুত্রকন্যাকে নিজের সাধনা আবার নূতন করিয়া নিজে করিতে হয়। দোষাশ্রিত পিতামাতার ঘরে জন্মিয়াও সাধনার দ্বারা অনেক পুত্রকন্যা নিজেদের ভবিষ্যৎ মহনীয়

এবং উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছে। শিক্ষা, দীক্ষা ও বংশ-সংস্কার এই তিনটাই যাহার অনুকূল, সে যদি অধ্যবসায়ী ও সাহসী হয়, তবে তাহার উন্নতির সম্ভাবনা সকলের চেয়ে বেশী। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা যে কাজ করিতে এতগুলি দিন ধরিয়া উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছিলে, তাহাই এখন অধিকতর উদ্যম সহকারে করিতে হইবে। নূতন করিয়া কোনও কর্ম্মতালিকা বাতলাইবার প্রয়োজন কোথায়?

সাধারণতঃ তোমরা কোনও একটা বিশেষ অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমাদের সংগঠন-কার্য্য চালাইয়া থাক। অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হইয়া যাইবার পরে মনে মনে ভাব যে, কাজ ত' শেষ হইয়া গেল, চল এখন ঘুমাইতে যাই। ঐ সহরে বা গ্রামে আর একটা বড় রকমের অনুষ্ঠানের তারিখ না জানা পর্য্যন্ত সকলে মিলিয়া কচ্ছপের মত হাত-পা গুটাইয়া থাক। কোনও একটা বড় অনুষ্ঠান হইয়া গেলেই তোমরা মনে করিয়া বস যে, তোমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহা কিন্তু তোমাদের মস্ত বড় ভুল। অনুষ্ঠানটী উপলক্ষ্যে

তোমারা যে সংগঠন সর্ব্বত্র করিয়াছ, তাহা ত' প্রারম্ভিক কাজ মাত্র। অনুষ্ঠানটী শেষ হইবার পরেই ত' জনসাধারণের মধ্যে তোমাদের আসল কাজ আরম্ভ হইবে। যাহা আরম্ভ, তাহাকেই তোমরা শেষ মনে করিয়া বসিয়া থাকিবে কেন?

তোমাদের রাজ্যের সদর সহরে যেই সকল কার্য্য তোমরা কতক দিন আগে করিলে, লক্ষ্য হিসাবে তাহারা কিছুই নহে, তাহারা পরবর্ত্তী লক্ষ্যের উপায় মাত্র। তিন চারি বৎসরে তোমরা সিঁড়ির মাত্র দুইটী ধাপ উঠিলে। বাধা, ষড়যন্ত্র, ঈর্ষ্যাকাতর বিরুদ্ধতা প্রভৃতির মধ্য দিয়াই দুইটী ধাপ উঠিয়াছ কিন্তু তোমাদের প্রতিপক্ষতা করিবার জন্য ভগবান যাহাদের নিয়োজিত করিলেন, তাহারা আতঙ্কিত হইয়াছে সেই দিকে তাকাইয়া, যেই দিকে তোমাদের আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহা হইতে কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, যাহাকে তোমরা শেষ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছ, তাহা তোমাদের আরম্ভ মাত্র?

গণ-নারায়ণ প্রেমের পূজা চাহেন। ধোকাবাজি করিয়া তাঁহাদিগকে গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় অন্ধবৎ পরিচালন তাঁহারা চাহেন না। নিত্য নূতন নেতা ও প্রবক্তারা আসিয়া নানা মতবাদে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া এক একটা ঝোঁকের বশে তাঁহাদের পরিচালন করুক, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। অথচ তাঁহাদের ভিতরেই যে পূর্ণব্রহ্ম সুপ্ত রহিয়াছেন, ইহাও তাঁহারা জানেন না। জানিবেনই বা কি করিয়া? সবাই বলিতেছেন, এই অবতারের পূজা কর, সেই অবতারের শরণাপন্ন হও। কেহ ত' বলিতেছেন না, "তোমাদের ভিতরেই সর্ব্ব অবতার বিরাজিত, তোমরাই তাঁর প্রতিচ্ছবি, যিনি নিজেকে ছড়াইলেন

কোটি বিশ্বে।" তোমরা প্রেম লইয়া ইঁহাদের ভিতরে প্রবেশ কর, সকলের ভিতরের সুপ্ত ঠাকুরকে জাগাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৬ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া তুমি পূর্ব্ববঙ্গের একটা আশ্রমের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া যাইতেছ, যাহার ভাবী ফলাফল কেহই জানে না। তোমার এই সাহসের প্রশংসা সকলেই করিবে।

কিন্তু তুমি যে বাবা একটা বিষয়ে বড়ই ভুল করিয়া যাইতেছ। সাহস আছে বলিয়াই কি পৃথিবীর সকল লোকের সঙ্গে বিরোধ লাগাইয়া দিতে হইবে? তুমি যে বাবা চোপার জোরে বন্ধুদেরও শত্রু করিয়া ফেলিতেছ। যাহার প্রতি তোমার কণামাত্র বিদ্বেষ নাই, তাহাকেও রুক্ষ্ম, রূঢ়, অপ্রীতিকর কথা বলিয়া বৃথা পর করিয়া দিতেছ।

তুমি এই বিষয়ে সাবধান হইবে কি?

আশ্রম চালাইবার ভিতরে কষ্ট আছে, আমি স্বীকার করি। কিন্তু সব কষ্ট তোমার মিথ্যা হইয়া যাইবে, যদি তুমি মানুষের সহিত মিষ্ট ব্যবহার করিতে না পার। মিষ্ট ব্যবহার করিতে হইলেই পেট ভরিয়া

সন্দেশ খাওয়াইতে হইবে, তাহা নহে। মানুষ মাত্রেরই আত্মসম্মানজ্ঞান আছে। কাহারও আত্মসম্মানে আঘাত না হানিয়া, প্রত্যেকের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিলেই মানুষ আপনা-আপনি অনুকূল হইয়া যায়। তুমি ভগবানের নাম করিয়া সংসার ছাড়িয়া আশ্রমে আসিয়াছ, সেই ভগবান যে তোমার চারিদিকে মানুষ রূপে বিচরণ করিতেছেন। যে পূজা তোমার বিগ্রহমূলে প্রদান কর, সেই পূজার অংশ যে তোমার ভক্তি-সহায়ে চারিদিকের সকল জীবে প্রসারিত হইয়া যায়। শুধু একটুখানি একখানা বিগ্রহেই তোমার প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা আটক পড়িয়া থাকিয়া যায় না। তাহার বিস্তার বিশ্বতোমুখ। সেই প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা চারিদিকের মানুষগুলিকেও ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায়। তুমি ভগবানের পূজা করিতেছ, শুধু এই কারণেই চারিদিকের মানুষ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তোমার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। কেহ হয়ত একটু কৌতূহল নিয়াই দাঁড়ায়, কেহ হয়ত একটু বিরূপতা নিয়াই দাঁড়ায়, কেহ হয়ত কিছু না ভাবিয়া না বুঝিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তুমি ভগবানকে ডাক বলিয়াই মানুষ তোমার কাছে আসে। এমতাবস্থায় কেন তুমি তাঁহাদের প্রতি প্রেম-কোমল হইবে না?

আশ্রমধারী সাধুদের অনেক গুণের সঙ্গে কখনো কখনো দোষও থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক দোষটা হইল আশ্রমবাসের অহঙ্কার। গৃহীরা সব কামের কীট, নরকের ঘৃণ্য জীব, নিয়ত কদাচারে পঙ্কিলচেতা পরমপাপিষ্ঠ, এইরূপ একটা উন্নাসিক ভাব এই অহঙ্কারের প্রত্যক্ষ কুফল। তাই গৃহীদের ব্যবহারে কোনও দোষত্রুটি বা ঔদ্ধত্য দেখিলে সাধুরা আর ক্ষমা করিতে পারেন না, চটিয়া-মটিয়া চিমটা

লইয়া ছুটিয়া যান তাহাদের পেট ফুটা করিয়া দিতে। তোমাকেও কি বাবা শেষে এই রোগে পাইবে? তুমিও কি এই সকল অসম্যগ্‌দর্শী সাধুদের মত ভুল করিবে?

তোমার পূর্ব্বে যাঁহারা আশ্রমের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁহাদেরও অনেক গুণগ্রাহী অনুরাগী ঐ অঞ্চলে আছেন। কারণ, একেবারে সম্পূর্ণরূপে দোষকলুষিত গুণবঞ্চিত মানুষ জগতে হয় না। তুমি তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মীদের সম্পর্কে নিষ্প্রয়োজনীয় বিরুদ্ধ মন্তব্য করিয়াও কতক আশ্রমানুরাগী প্রতিবেশীকে বিরক্ত করিয়াছ। আগে আসিয়া কে কি ভাবে আশ্রমের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া স্থানান্তরে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়াইয়াছে, এই অপবাদ সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, নিতান্তই অতীতের কথা এবং তোমার আয়ত্তের বাহিরে। অতীতে কেহ কোনও অন্যায় করিয়া থাকিলে, তাহার প্রতীকার আজ তোমার সাধ্যে নাই। বৃথা ব্যাপারে মাথা ঘামাইয়া মনকে ক্লান্ত করিয়া লাভ কি?

আশ্রমকে তুমি যে দীনাবস্থায় পাইয়াছ, তাহার মধ্য দিয়াই ইহার উন্নতি সাধনে তোমাকে মনোযোগী হইতে হইবে। আশ্রম-প্রতিবেশীদের যত জনকে যে ভাবের ভাবুক দেখিতেছ, তাহা প্রশংসনীয় বা আপত্তিজনক যাহাই হউক না কেন, ইঁহারা ভগবানেরই প্রতিনিধি, এই ভাবটুকু অন্তরে রাখিয়া ইঁহাদের প্রদত্ত আনুকূল্য, ঔদাসীন্য ও বিরুদ্ধতাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আজ যাঁহারা অনুকূল, তোমার প্রশংসনীয় আচরণ ভবিষ্যতে তাঁহাদের মনে বিরুদ্ধতা আনিতে পারে। আজ যাঁহারা উদাসীন, তোমার নীরব কর্ম্মযোগ দেখিয়া ক্রমে তাঁহারা

আকৃষ্ট হইতে পারেন। আজ যাঁহারা বিরুদ্ধবাদী বা বিরুদ্ধকারী তাঁহারা এক সময়ে সর্ব্বান্তঃকরণে সহায়ক ও সহযোগী হইবেন না, এ কথা এখনই তুমি সাব্যস্ত করিয়া ফেলিবে কেন? আজ যিনি যাহা কাল তিনি তাহা নাও থাকিতে পারেন, কারণ জগৎ পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং প্রত্যেকটী নরনারী একদিন তোমার পুণ্যকর্ম্মের যাহাতে অনুকূল হন, তার দিকে তাকাইয়া তুমি ইঁহাদের আপাতদৃষ্ট ক্ষতিকর ব্যবহারকে ক্ষমার চোখে দেখ।

ক্ষমা মহতী শক্তি কিন্তু ক্ষমার অহঙ্কার অপরের সম্মানে বড় আঘাত দেয়। সাত্ত্বিক ক্ষমা নিজের সহিষ্ণুতার যশোগান করে না। আর প্রকৃত ক্ষমা আসে তখন, যখন হৃদয়ে জাগে প্রেম। আমি চাহি তোমরা সকলে সকলের প্রতি ক্ষমাশীল হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিবে। তোমার সকল পত্রই পাইয়াছি। বিভিন্নমতাবলম্বী ধর্ম্ম-সাধকদের সহিত নিরুপদ্রব সৌহার্দ্দের মধ্য দিয়া কাটাইতে চেষ্টা করিও। ধর্ম্মের ব্যাপার নিয়া ঝগড়া-কলহ করিয়া কোনও লাভ নাই। কারণ, তাহাতে অধর্ম্ম বাড়িয়া যায়। রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়া ঝগড়া-কলহ যে যার সঙ্গে

যত পার কর, কারণ রাজনীতির পথই হইতেছে চাতুরী আর ছলনার পথ। খলকে তার নিজের অস্ত্র দিয়া যে ঠকিতে না পারে, সে নিজে ঠকে। বৈষয়িক জগতে নিজে ঠকিয়া অপরকে জিতাইয়া চলিবার অভ্যাস একবার হইয়া গেলে অহিফেণের এই নেশা আর জাতিকে ছাড়িতে চাহে না। জগতের কাছে মহৎ বলিয়া পূজা পাইবার লোভে রাজনৈতিক কাপুরুষতাকে উদারতা বলিয়া একবার চালু করিলে সেই জাতির আর রক্ষা নাই।

কিন্তু সত্যিকারের ধর্ম্মের কথা তাহা নহে। সকল ধর্ম্মেরই লক্ষ্য এক পরমেশ্বরেরই আরাধনা। সুতরাং এক ধর্ম্মের সহিত অপর ধর্ম্মের বিরোধ-সৃষ্টি স্বাভাবিক নহে।

কেহ হয়ত ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জগতে নিজেদের গোষ্ঠীর প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির জন্য যত্নবান। তাহাদের পক্ষে অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিরোধ সৃষ্টি ব্যতীত গত্যন্তর কি?

কিন্তু তোমাদের ধর্ম্মমত উদার, স্বচ্ছ এবং সর্ব্বালিঙ্গনকারী। তোমরা সকল ধর্ম্মের প্রতি সহিষ্ণু থাকিয়া নিজের ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠাশীল থাকিও। তোমরা সাধারণ লোকের ন্যায় গ্রাম্যতাকে প্রাধান্য দিও না।

ধর্ম্মের একটা সর্ব্বজনীন রূপ আছে, যেখানে সকল মত ও পথের লোকেরা অন্তরের শ্রদ্ধা জানাইতে পারে। তোমরা সেই অবস্থাটীর প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়া চলিও। নিজেদের ধর্ম্মাচরণগুলির মধ্যে এমন কোনও নূতন জটিলতার সৃষ্টি করিও না, যাহার দ্বারা সকল মত ও সকল পথের লোকেরা তোমাদের অনুষ্ঠানে কুণ্ঠাহীন

মনে যোগদান করিতে বাধা বোধ করিতে পারে। তাই বলিয়া ইহা বলিতে চাহিতেছি না যে, একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ হয়ত আসিয়া বলিলেন, "কলিতে ওঙ্কার-বিগ্রহ চলিবে না, তুলিয়া দাও", একজন মুসলমান হয়ত আসিয়া বলিলেন, "ওঁঙ্কার-বিগ্রহ বসাইয়াছ, কিন্তু উহা ত' পুতুল, পুতুল-পূজা চলিবে না", একজন ইহুদী আসিয়া হয়ত বলিলেন, "ঈশ্বর ত' নিরাকার, তোমরা সাকার বিগ্রহ বসাইয়াছ, ইহা সরাইয়া নিতে হইবে", একজন নির্গুণ-ব্রহ্মবাদী আসিয়া হয়ত বলিলেন, "তোমাদের স্তোত্রে ব্রহ্মকে অমৃত, সুন্দর, শান্ত, সত্য, শুদ্ধ, নির্ম্মল, নিষ্কল, পূর্ণ, পিপাসাতে তৃষ্ণাপহারক, প্রার্থনায় কামপূরক ইত্যাদি বলা হইয়াছে, সুতরাং চলিবে না এই ধর্ম্মাচরণ", আর অমনি তোমরা পাততাড়ি গুটাইয়া ফেলিবে। এই জাতীয় আপত্তি উত্থাপিত যদি হয়ও, তবু তোমাদের ধর্ম্মাচরণ তোমরা অবশ্যই করিবে। আমার বক্তব্য এই যে, ধর্ম্মের মূলসূত্র যে ঈশ্বরপ্রীতি এবং সর্ব্বজীবে সমবুদ্ধি, তাহা হইতে তোমরা কখনও পরিভ্রষ্ট হইতে পার না। ধর্ম্ম তোমাদিগকে যেমন ভগবানের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিবেন, তেমন আবার বিশ্বের সকল মানবের সঙ্গেও জড়াইয়া ধরিবেন।

ধর্ম্মে ধর্ম্মে কলহ একটা নিতান্ত নীচ গ্রাম্যতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই গ্রাম্যতা হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান আদির মধ্যে যথেষ্ট চলিয়াছে। তাহার আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। কিন্তু অবস্থাটা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় তখন, যখন একই খ্রীষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সাতটা দল হইয়া পরস্পরের প্রতি পরস্পর লোষ্ট্র-নিক্ষেপ সুরু করে, একই মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেই দশটা দল হইয়া একে অন্যের

রক্তপাতের জন্য ক্ষেপিয়া ওঠে, একই হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেই সাড়ে ছত্রিশটা দল হইয়া পরস্পরের নিন্দা-কুৎসায় হয় পঞ্চমুখ।

এই দিক দিয়া হিন্দুদের অবস্থা ত' সকলের অপেক্ষা শোচনীয়। খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসী, কিন্তু গণ্ডায় গণ্ডায় ঈশ্বর-পুত্রের আবির্ভাব তাঁহারা সম্ভব মনে করেন না, মেরীর পুত্র যীশুই একমাত্র ঈশ্বর-পুত্র এবং তিনিই একমাত্র ত্রাণ-কর্ত্তা। মুসলমানেরা বহু নবীতে বিশ্বাসী কিন্তু সেই সকল নবী মহম্মদের অনেক আগেই আবির্ভূত হইয়া নিজ নিজ কাজ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং মহম্মদের প্রতিদ্বন্দী দাঁড়াইবার কোনও আশঙ্কা নাই। তাঁহাদের অবশ্য ইমাম মেহেদী ভাবী কালে আবির্ভূত হইবেন কিন্তু এ যাবৎ যে কয়জন নিজেদিগকে ইমাম মেহেদী বলিয়া দাবী করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন, তাঁহারা ক্ষমাহীন শাসনে নিরস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং ভাবী কালে কবে যে ইমাম মেহেদী সত্য সত্য আবির্ভূত হইবেন, তাহার অনুমান দুঃসাধ্য। বৌদ্ধদেব গৌতম বুদ্ধ বহু জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপিয়া তপস্যা ও দশশীল আচরণ করিয়া সম্যক্-সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনিই সকলের ধ্যানের দেবতা কিন্তু তাঁহারই ন্যায় তপস্যা ও দশশীল আচরণের দ্বারা জগতের প্রত্যেক মানবই বুদ্ধত্ব লাভের অধিকারী এবং এই বুদ্ধত্ব লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র পুরুষার্থ ও লক্ষ্য। কিন্তু আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় আর কোনও জগৎপূজ্য বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই। সুতরাং আগামী কত হাজার বছরের মধ্যে আর একজন সম্যক্-সম্বুদ্ধ আবির্ভূত হইবেন তাহার ধারণা করা কঠিন। কিন্তু হিন্দুরা এই সকল বিষয়ে বড়ই নিরঙ্কুশ ও বেপরোয়া। শাস্ত্রে

যেই সকল অবতারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন শাস্ত্রে তাহা অপেক্ষাও অনেক নূতন নূতন অবতারের পূজা-প্রবর্ত্তনের অনুকূল উক্তি আছে। তারপরে আধুনিক কালে অর্থাৎ পদ্ধতিবদ্ধ ইতিহাস রাখিবার রীতি যেই যুগে প্রচলিত হইয়াছে, সেই কালে আরও নূতন নূতন মহাপুরুষ ঈশ্বরের অবতার রূপে গৃহীত হইয়াছেন, যাঁহাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ শাস্ত্ররূপে সম্মানিত গ্রন্থাদিতে নাই কিন্তু প্রাণের ভক্তিবশতঃ একটু কষ্টকল্পনার আশ্রয় করিয়া যাঁহাদের শাস্ত্রীয় প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে বহু মেধাবী পুরুষকে আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছে। ইহারও পরে অত্যাধুনিক যুগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এমন কি এই বাংলারই নানা অঞ্চলে নানা মহাপুরুষ নিজ নিজ ভক্তগণমধ্যে ঈশ্বরাবতার রূপে পূজা পাইয়াছেন। এই সকল মহাপুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ দূরদূরান্তরের ভক্তদেরও পূজার অর্ঘ্য পাইয়াছেন, কাহারও কাহারও পূজা-পুষ্পাঞ্জলি নির্দ্দিষ্ট কতকটা স্থানের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মহাপুরুষগণের জীবনে প্রচারোপযোগী দৃষ্টান্ত ও বিষয়ের প্রাচুর্য্য তথা বিরলতা এই পার্থক্যের আংশিক কারণ। মহাপুরুষগণের শিষ্যানুশিষ্যবৃন্দের মধ্যে প্রচারদক্ষতার সমাবেশ বা অভাবও এই পার্থক্যের অপর কারণ। কেহ কেহ ভগবানের পূর্ণাবতার রূপে পরিপূজিত হইয়াছেন, কেহ শিবাবতার, রুদ্রাবতার, ভৈরবাবতার, বজরংবলীর অবতার ইত্যাদি বলিয়া নিজ নিজ শিষ্যগণের মধ্যে পূজিত হইতেছেন। যাঁহাদিগকে অবাধে কৃষ্ণাবতার বা রামাবতার বলিয়া বর্ণনা সম্ভব হইতেছে, তাঁহারা পূর্ণাবতারের সম্মান পাইতেছেন।

মোট কথা, হিন্দুরা সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে পূর্ণরূপে দেখিতে অভিলাষী এবং পটু, এই কারণে নিত্য নূতন মহাপুরুষেরা ঈশ্বরাবতারের সম্মান পাইতেছেন এবং নিত্য নূতন গুরুদেবদের আবির্ভাব কিছুকাল পরে পরে বিরাট অবতার-গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে রূপ নিতেছে।

ইহা মন্দ কি ভাল, তাহা বলিতে চাহিতেছি না কিন্তু ইহারই ফলে হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ অন্য যে-কোনও ধর্ম্মাবলম্বীদের অপেক্ষা বেশী। রামের গুরুকে রাম ঈশ্বরাবতার রূপে পূজিত হইতে দেখিতে চাহে, শ্যামের গুরুকেও শ্যাম তাহাই চাহে, যদুর গুরুকে যদু তাহা অপেক্ষা এক চুল কম দেখিতে চাহে না, মধুর গুরুই বা সাধারণ একজন গুরু রূপে জনসমাজে পরিচিত হইবেন কেন, মতিরঞ্জন চাহে তাহার গুরুকে সকল গুরুদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত করিতে, সতীরঞ্জন চাহে জগতের সকল গুরুকে তাহার গুরু অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত করিতে, মনোরঞ্জন চাহে তাহার গুরুদেবের পার্থিব জীবনের অপার্থিব ব্যাখ্যা দ্বারা জগতের সকল আচার্য্যদের মাথা হেঁট করিয়া দিতে।

যুক্তি-বিচারের দ্বারা গুরুকে জগৎ-সমাজে সমাদৃত করিতে যে পরিমাণ কাঠ-খড়ের প্রয়োজন, কোনও প্রকারে গুরুদেবের মত ও পথে লোককে দীক্ষা লওয়াইতে পারিলে মানামানির ব্যাপারে আর তত উদ্বেগ পোহাইতে হয় না। একটী মেয়েকে জোর করিয়া বিবাহ করিবার পরে তাহাকে পোষ-মানান অতি সহজ, কিন্তু আগে হইতে বুঝ-প্রবোধ দিয়া বিবাহের জন্য রাজি করাইতে হইলে অনেক তেল-নূন খরচ করিতে হয়। দীক্ষাটাও বিবাহেরই মতন একটা ব্যাপার।

একবার কাহাকেও জোর করিয়া দীক্ষা নেওয়াইতে পারিলে, দেশ-প্রথানুযায়ী আস্তে আস্তে দীক্ষিতের মন একটু একটু করিয়া যুক্তির রাশ ছাড়িয়া দিবে এবং সমদীক্ষিতদের মধ্যে গুরুদেব সম্পর্কে সম্ভব অসম্ভব যে সকল ধারণা প্রচলিত করা হইয়াছে, তাহারই নিগড়ে বাঁধা পড়িবে। সুতরাং চালাও দীক্ষার রথ সজোরে। কোথাও চাকুরীর লোভ দেখাইয়া, কোথাও সর্ব্বনাশের ভয় দেখাইয়া, কোথাও আসন্ন বৈধব্যের বা পুত্রবিয়োগের অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া, কোথাও চিরদারিদ্র্য নাশের আশ্বাস দিয়া, কোথাও কঠিন রোগ হইতে মুক্তিলাভের প্রতিশ্রুতি দিয়া, কোথাও জলন্ত উনানে লোহা পুড়িয়া লাল-ডগ্ডগে সেই লোহা দ্বারা পাছায় ছ্যাকা দিয়া দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়াও।

হয়ত ভবিষ্যতে এমন কথাও শুনিতে পাইব যে, মুখের উপর কার্ত্তুজ-ভরা ছয়-ঘরা পিস্তল ধরিয়া লোককে দীক্ষা নিতে বাধ্য করা হইতেছে।

এই যে সম-দীক্ষিতের সংখ্যা-বৃদ্ধির চেষ্টা, তাহার মধ্যে নিজ গুরুকে জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার লালসাটাই প্রধান স্থান গহণ করিয়াছে। শিষ্যদের কাছ হইতে নিয়মিত অর্থসংগ্রহের ইচ্ছা তাহার তুলনায় অনেক গৌণ। অবতার-বাদ প্রচারের দ্বারা সঙ্ঘের শিষ্য-সংখ্যা বর্দ্ধন এই দেশে সহজও।

কিন্তু এই দুইটী কারণই সঙ্ঘে সঙ্ঘে বিরোধ বাঁধাইবার পক্ষে যথেষ্ট।

অন্য কোনও সঙ্ঘ হয়ত নূতন কোনও বার্ত্তা বহন করিতেছে। কিন্তু কেন করিবে? জোর করিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দাও।

অন্য কেহ আসিয়া নূতন কথা কহিলে বা পুরাতনী কথাকে নূতন করিয়া বলিলে আমার যে সঙ্ঘানুবর্ত্তীর সংখ্যা বাড়ে না!

এই সকল দুশ্চিন্তা বিভিন্ন সঙ্ঘানুবর্ত্তী লোকদের মনকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার ফলে তাহাদের অন্তরের প্রেম শুকাইয়া ক্রোধের মূর্ত্তি ধরিতেছে, তাহাদের আত্মোন্নতীচ্ছা ঈর্ষ্যায় পরিণত হইয়া দৃষ্টিকে করিয়া দিতেছে ঝাপসা।

কতক কাল ধরিয়াই ত' চারিদিকে তাকাইয়া এই সকল কথার সত্যতার দৃষ্টান্ত সমূহ দেখিতে পাইতেছ। অপরের ব্যাপার দেখিয়া নিজেরা সাবধান হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার যে আত্মীয়টী অসুস্থ, তিনি দ্রুত সুস্থ হউন, এই আশীর্ব্বাদ করি। ঔষধের ব্যবস্থা স্থানীয় বিজ্ঞ চিকিৎসকের সহায়তায় করিয়া লইও।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা বলিব। পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক অসুখে ভুগিয়া থাকে। তাহাদের সকলেরও নিরাময়-কামনা করিও। পৃথিবীর সকলে যদি সকলের নিরাময়-কামনা করে, তাহা হইলে

সকলের সম্মিলিত ইচ্ছা হইতে মহামঙ্গল উদ্ভুত হইতে পারে।

কেহ সখ করিয়া রোগ-সৃষ্টি করিয়াছে। কেহ মহামোহান্ধতা হইতে রোগ পাইয়াছে। কাহারও রোগের কারণ অজ্ঞতা ও দরিদ্রতা। কাহারও রোগ আসিয়াছে পূর্ব্বপুরুষের অসংযত জীবন হইতে। কেহ বা অজ্ঞাত কারণে রুগ্ন হইয়াছে।

কিন্তু সকলের রোগই দুঃখদ। রোগ, ঋণ আর অগ্নি এই তিনের শেষ রাখিতে নাই। সকলের দুঃখ দূর হউক, এই প্রার্থনা এস আজ আমরা প্রতি জনে করি। রোগ-সৃষ্টির সবগুলি কারণই আমরা পৃথিবী হইতে নির্ম্মূল করিব।

ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত এত বড় প্রার্থনা পূরণের অনুকূল অবস্থা সৃষ্ট হইতে পারে না। এস আমরা প্রতিদিনই প্রতি জনে এই সঙ্কল্প করি।

দীক্ষাদান-কালে তোমাদের প্রতিজনকে জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প দিয়াছিলাম। অর্থ না বুঝিয়া তোতাপাখীর মত সেই সঙ্কল্প-মন্ত্র আওড়াইয়া গেলেই হইবে না। নিজের আত্মীয়ের দুঃখ দেখিয়া বুঝিয়াছ যে, দুঃখ কাহারই কাম্য নহে। এস আজ সকলে অর্থ বুঝিয়া সঙ্কল্প করিতে থাকি যে, আমরা জগতের মঙ্গলকারী হইব। জগতের সকলের সহিত আমাদের প্রেমের সম্বন্ধ রহিয়াছে। জগতের হিতার্থে কিছুই যদি না করি, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধের সত্যতা বজায় থাকে কি করিয়া? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আশিস নিও।

পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছ জানিয়া আনন্দিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, জগন্মঙ্গলময় সুদীর্ঘ সুমহৎ জীবন সে যাপন করুক। পুত্র যখন বড় হইয়া উঠিবে, তখন তাহাকে অনুকূল শিক্ষাও দিতে হইবে। আমার আশীর্ব্বাদের সহিত তোমাদের আপ্রাণ সেবারও প্রয়োজন হইবে।

সম্প্রতি তোমাদের জেলার সীমান্তগুলির অবস্থা বড়ই জটিল হইয়া গেল। নাগা-বিদ্রোহীদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ শান্তিপ্রিয় পর্ব্বত-বাসীদের ভিতরে আমাদের প্রচার ও সংগঠন-কার্য্যকে বিপজ্জনক করিয়া দিল। আসাম সরকার নিরাপত্তা-রক্ষার দিক তাকাইয়া নূতন যে সকল ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহা অশান্তি-দমনের উদ্দেশ্যে গৃহীত হইলেও আমাদের ধর্ম্মাভিযান সমূহ পরিচালনের ব্যাপারে সহায়ক হইবে বলিয়া মনে হয় না। এখন বুঝিয়া দেখ যে, আমি যে বারংবার তোমাদিগকে সময় নষ্ট না করিয়া অবিলম্বে কাজে নামিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছি, তাহা সত্যই সময়োপযোগী হইয়াছিল কিনা। তোমরা সময়কে সদ্ব্যবহারে আনিলে বর্ত্তমানে দুই এক বৎসর কার্য্য-বিরতি অবলম্বন করিলেও বিশেষ ক্ষতি হইত না।

ধর্ম্মের একটা শাশ্বত আবেদন আছে, যাহা রাজনীতি বা

সমরনীতির নাই। একজন আলেকজাণ্ডার, সীজার, নেপোলিয়ান বা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের আবেদন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু একজন বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, চৈতন্যের ধর্ম্মের আবেদন চিরস্থায়ী। পৃথিবীতে যুক্তিবাদী জনগণের প্রাধান্য যতই বাড়ুক না কেন, যতক্ষণ ধর্ম্ম পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার জন্য ব্যবহৃত না হইবে, ততক্ষণ তাহার সম্মান কাড়িয়া নিবে কে? অবশ্য, সকল ধর্ম্মগুরুরই ধর্ম্মকে একদল লোক অপরের উপরে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপনের উপায়রূপে ব্যবহার করিয়াছে এবং অনেকে নিজ ধর্ম্মগুরুর ধর্ম্মকে জীবিকার্জ্জন ও পরের পকেট-কাটার কাজে আনিয়াছে। তাই বলিয়া সকল লোক এখনও তাহা নহে। এই কারণেই এই সকল ধর্ম্মগুরুর ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বজীবের জন্য শাশ্বত আকর্ষণ রহিয়াছে।

তোমরা ধর্ম্মকে তাহার সহজ, সরল, আড়ম্বরবর্জ্জিত, কপটতাহীন, সুলভ সুষমায় দেখিতে চেষ্টা কর আর তাহাই বিতরণের কাজে বদ্ধপরিকর হও। তোমাদের জেলার পূর্ব্ব এবং উত্তরাঞ্চলে কাজ এখন কঠিন, সুতরাং সমস্ত জেলার সকলগুলি মণ্ডলী দক্ষিণ এবং পশ্চিম সীমান্তের দিকে দৃষ্টি দাও। এখনও চারিদিকে এমন হাজার হাজার বনপর্ব্বতবাসী রহিয়াছে, যাহাদিগকে খোঁজা হয় নাই বলিয়া সকল সভ্যতাভিমানী সমাজের নিকট ইহারা সম্পূর্ণ অপরিচিত রহিয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার মাণিঅর্ডার পাইয়া সুখী হইলাম। তোমরা হিন্দু-মুসলমান-পাহাড়িয়া সকলে মিলিত হইয়া একটী বিশেষ সমবেত উপাসনা করিয়াছ জানিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। আমি পূর্ব্ববঙ্গের চাঁদপুরে শ্রীরামদী পল্লীতে স্বর্গীয় ভগীরথ দাস মহাশয়ের বাড়ীতে যখন সমবেত উপাসনা করিতাম, তখন বহু উপাসনাতে স্থানীয় মাদ্রাসার বি-এ পাশ করা মৌলবী সাহেব উপাসনায় যোগ দিতে আসিতেন। আমি যখন শ্রীহট্টে রায়বাহাদুর দুর্গেশ্বর শর্ম্মার গৃহে যৌগিক আসন-মুদ্রা শিক্ষা দিতাম, তখন শ্রীহট্ট মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিজে আসিতেন যৌগিক ব্যায়াম শিক্ষা করিতে। কিন্তু শ্রীরামদীর মৌলভী সাহেবের সমবেত উপাসনায় যোগদান ব্যাপারটা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক তাৎপর্য্যপূর্ণ। আমাদের উপাসনার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধমাত্র নাই, ইহা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের দ্বারা সাম্প্রদায়িক দেবতার পূজা নহে, ইহা বিশ্বমানবের দ্বারা বিশ্বদেবের পূজা। এই জন্যই শ্রীরামদীতে যেমন মুসলমান মৌলবীর পক্ষে উপাসনায় যোগদান সম্ভব হইয়াছে, তোমাদের ওখানেও তেমন স্থানীয় মুসলমানেরা উপাসনায় যোগ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বিশ্বের সকলে মিলিয়া ভগবানকে ডাকা এক সুমহৎ সৌভাগ্য।

ধর্ম্মের এমন একটা নিজস্ব রূপ আছে, যাহা হিন্দু, মুসলমান,

খ্রীষ্টান আদি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মার্কাকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে। ধর্ম্মের সেই রূপটী খোলে তখন, যখন মানুষ পরমেশ্বরের সহিত পরমলগ্ন হয়। মানুষ যখন কেবল ভগবানের জন্য, কোন সাম্প্রদায়িক দল-বিশেষের জন্য নয়, তখন এক মানুষের সহিত বিশ্বের সকল মানুষের মিলন স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। তোমাদের লক্ষ্য হউক, সর্ব্বদা উন্নতির সেই স্তরটীতে থাকা।

ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হইবার আন্তরিক রুচি বৃদ্ধি হইবে, এই ভরসায়ই মানুষ একটা সম্প্রদায়ে যূথবদ্ধ হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা মানুষকে এমন অন্ধ মূঢ়তায় আবিষ্ট করে যে, সে অনায়াসেই ভুলিয়া বসে যে, যেই পরমেশ্বরের সহিত মিলন সহজ ও সুগম করিবার জন্য তাহার ধর্ম্মীয় অনুশাসনের বৃ্যহ-বিস্তার, তিনি সকল সম্প্রদায়ের জন্যই এক।

একজন মুসলমান সজ্জন তোমাদের সমবেত উপাসনায় একটী টাকা প্রণামী দিয়াছেন জানিয়া আরও প্রীত হইলাম। এই টাকাটী প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন। ইহাকে এক কোটি মুদ্রার সমান বলিয়া জ্ঞান করিবে। যদি গ্রহণে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদেরও ধর্ম্মানুষ্ঠানে তোমরা কায়-মনো-বাক্যে এবং অর্থাদি দ্বারা নিশ্চিত সহায়তা করিবে।

তুমি সাংসারিক অশান্তিতে জরজর হইয়া পড়িয়াছ জানিয়া ব্যথিত হইলাম। সংসার চিরকাল থাকিবে না, ইহা অনিত্য জানিয়া ইহার উৎপাতগুলি সাহসের সহিত সহ্য করিয়া যাইবার মনোবল সংগ্রহ করিতে যত্নবান হও। ভগবানকে ধ্রুবতারা করিয়া নৌকা

চালাও। তোমার নৌকা বিপথে ধাবিত হইতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আজ একমাস যাবৎ বনপাহাড়ের কাজ একেবারে বন্ধ বলিয়া লিখিয়াছ। কারণ, তুমি অসুস্থ। আশীর্ব্বাদ করি, দ্রুত সুস্থ হও। কাজ একমাস বন্ধ, এই সংবাদে কে না দুঃখিত হইবে? কিন্তু আমি দুঃখিত ইহা ভাবিয়া যে, একজনের অসুখ হইলে অন্যরা আসিয়া কাজে হাত দেয় না। আর, তোমার সুস্থ থাকা কালেই বা তোমাকে একাকী কাজ করিতে হইবে কেন? জগতের সব কাজ একা কেহ কখনও শেষ করিতে পারে কি? সকলে মিলিয়া কাজে হাত না দিলে কোনও বৃহৎ ও মহৎ কাজ সুসম্পন্ন হয় কি? তুমিই বা কেন এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া রহিলে যে, একা তোমাকেই কাজ করিতে হইবে; তোমার অঞ্চলের তোমার সমধর্ম্মীরাই বা কেন মনে করিয়া নিশ্চিন্ত রহিল যে, বনপাহাড়ের কাজে তাহাদের মাথা গলাইবার প্রয়োজন নাই?

প্রায় সকল স্থানেই এই একটা দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করিতেছি যে, যদি কোনও সৎপ্রয়াস কোথাও সুরু হয়, তাহা হইলে তাহা একজন আর

দুইজনের শ্রম ও ত্যাগের উপরেই নির্ভরশীল, সকলের সম্মিলিত শক্তি আসিয়া কাজে লাগিয়া যায় না। অথচ কলিযুগে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার যোগ্যতার মধ্যেই রহিয়াছে শক্তির উৎস নিহিত।

তোমার দোকানে পাহাড়ীরা কেহ কেহ আসে আর তুমি তাহাদের সহিত সদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে উন্নত ভাব পরিবেশন করার চেষ্টা কর, বনপাহাড়ের কাজ বলিতে যদি ইহাই বুঝিয়া থাক, তবে এ কাজ একাকী-সাধ্য বৈ কি? কিন্তু বনপাহাড়ের ভিতরে আসল যে কাজ আমি চাহি, তাহা এত সহজ নহে। তুমি তোমার দোকানে বসিয়া যেটুকু করিতেছ, তাহার মূল্য আমি কমাইতে চাহি না কিন্তু আমি যাহা চাহি, তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক কাজ। তোমাদের অঞ্চলে আমার ভাবের ভাবুক যাহারা আছে, তাহারা সকলে মিলিত হইয়া মাসে অন্ততঃ একটী বার করিয়া এক একটা কেন্দ্রে গিয়া পাহাড়ীদের মধ্যে প্রবেশ করিবে, তাহাদের সহিত একত্র অবস্থান করিবে, তাহাদের সুখ-দুঃখের খবর নিবে, তাহাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালী প্রত্যক্ষ দেখিবে, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া কীর্ত্তন-উপাসনাদি করিবে এবং ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনার দ্বারা তাহাদের মনে নূতন আলোক-সম্পাত করিবে।

আমি ইহাকেই বলি, বনপাহাড়ের কাজ। তোমরা নিজ নিজ দোকানে বসিয়া দুই চারিজন পাহাড়ী লোকের সঙ্গে হাট-বাজারের দিনে একটু ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ করিলে, কিম্বা "কি ভাই কেমন আছ" জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাকে আমি বনপাহাড়ের কাজ আখ্যা দেই না।

তোমরা অনেকে কাজের প্রকৃত অর্থ এবং যথার্থ লক্ষ্য কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা কর নাই বলিয়া ঘরে বসিয়া বসিয়া দুই চারিজন বন্ধু লোকের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করিয়াই হয়ত মনে করিয়া বসিয়া আছ যে, বনপাড়াড়ের কাজ ইতিমধ্যে করা হইয়া গিয়াছে।

প্রতি বৎসর তুমি ওঙ্কার-বিগ্রহ রথে চড়াইয়া এক উৎসবানন্দ করিতেছ দেখিয়া খুব তৃপ্তি অনুভব করিতেছি। কিন্তু তোমার অদ্যকার পত্র হইতে মনে হইল যে, এই আনন্দজনক অনুষ্ঠানটীও তুমি একা নিজের উপরে চোট রাখিয়াই কর। কোনও উৎসবেরই লক্ষ্য কিন্তু ইহা নহে। সকলের সম্মিলিত শক্তি একত্র আসিয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে-কোনও সৎ উদ্দেশ্যকে পূরণ করিবার জন্য লাগিয়া গেলে, তাহাকে নাম দেওয়া হয় উৎসব। তোমার চারিদিকে তোমার যে সকল সমভাবের ভাবুক আছে, তাহাদের সকলকে সৎকর্ম্মের কর্ম্মী কেন করিতে পারিতেছ না? তাহাদিগকে যদি কাজে না নামাইতে পার, তাহা হইলে যতকাল জীবিত থাকিবে, একাই ত' উৎসবের ঘানি টানিতে হইবে। তখন উৎসব আর আনন্দের খনি থাকিবে না, চখ-বাঁধা বলদের কষ্টটা ভোগ করিতে কোনও অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে উৎসবও বলা চলে না। দুই এক বৎসর বরং উৎসব বন্ধ রাখ, তবু ইহাকে কলুর বলদের প্রাণান্তকর নিরস শ্রমে পরিণত হইতে দিও না।

তোমাদের সমবেত উপাসনাগুলিও এইভাবে অনেক স্থানে কলুর ঘানির ন্যায় নীরস দুর্ব্বহ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া আমার মনে হয়। যাহা সকলের সম্মিলিত অনুষ্ঠান, তাহাতে সকলে নিজ নিজ কর্ত্তব্য

পালন করে না। জনে জনে কিছু কিছু করিয়া পুষ্প-বিল্বপত্র নিয়া আসা এমন কিছু কঠিন কাজ নহে। কিন্তু তাহাতেও দেখা যায়, শ্রম একজন আর দুইজনকেই পরিবর্ত্তন হয় নিজেদের আনন্দে নিজেরাই নিজেদিগকে বঞ্চিত রাখা যে কত বড় মূর্খতা, তাহা এখনো অনেককে বুঝাইয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু ইহাই যদি দাঁড়ায় সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার বদ্ধমূল রীতি, তাহা হইলে উৎপীড়নের ভয়েই ত' অনেকে নিজ গৃহে সমবেত উপাসনা ডাকিতে পরাঙ্মুখ হইবে।

কবে তোমরা সকল কাজে সকলে হাত দিবে? কবে তোমরা উৎসব ও উপাসনা প্রভৃতির সার্ব্বজনিক দায়িত্ব উপলব্ধি করিবে? কবে সমবেত উপাসনাদি সামূহিক অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তনের প্রকৃত উদ্দেশ্য তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, সকলে নববর্ষের প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কতক কাল যাবতই শুনিতেছি, তুমি তোমার এক গুরুভগিনীর দালান-বাড়ী দখল করিয়া তাহাতে একটী আশ্রম স্থাপনের জন্য চেষ্টিত হইয়াছ। ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইলাম। সেই বেচারী অর্থের

অনটন হেতু নিজ বাড়ী অন্য লোকের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। তুমি ক্রেতাকে বাড়ী অধিকার করিতে দিতেছে না এবং বলিতেছ যে, এই বাড়ীতে তুমি তোমার বাবামণির আশ্রম করিবে।

পরের বাড়ী নিজ টাকা দিয়া রাখ নাই, বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে একবার স্বপ্নেও কল্পনা কর নাই যে, এই বাড়ীতে একটা আশ্রম হইতে পারে। আজ পূর্ব্ববঙ্গের ভূসম্পত্তি নিয়া যখন লোকেরা উদ্ব্যস্ত ও উদ্বাস্তু, সেই সময়েই হঠাৎ তোমার মনে কুবুদ্ধি আসিয়া গেল যে, এখানে তোমার গুরুদেবের একটী আশ্রম করিতেই হইবে!

কিন্তু তুমি কি মা তোমার গুরুদেবকে সত্য সত্য চেন?

জোর, জবরদস্তি, পাপ, ছলনা, মিথ্যা বা অপরাধের দ্বারা অর্জ্জিত সম্পত্তিতে আমার আশ্রম হয় না। বিনা ব্যবহারে জমি পড়িয়া আছে, আশ্রম করিলে মালিকপক্ষ হইতে কেহ বাধা দেয় না, এমন ভূমির কথা স্বতন্ত্র।

তুমি অবিলম্বে জোর-করিয়া-দখল-করা জমি ও বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাও। আমার আশ্রম যখন যেখানে হইবার, সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার মধ্য দিয়াই হইবে। যার বাড়ী দখল করিয়া তুমি আজ আমার আশ্রম স্থাপনে উদ্যত হইয়াছ, এক সময়ে তাহার সহিত তোমার অন্তরের গভীর প্রীতি ছিল। নির্ব্বোধের ন্যায় আচরণ করিয়া তুমি এমন প্রিয়জনের সহিত অপ্রেম সৃষ্টি করিয়াছ। একটা আশ্রমের চেয়ে অকৃত্রিম প্রেম অনেক বড় জিনিষ। সত্য ও ন্যায় হইতে স্খলিত হইয়া আশ্রম গড়ার মধ্যে কোনও সার্থকতাও নাই মা।

কুহকিনী সম্পত্তি-লালসা তোমাকে ভ্রান্ত বুদ্ধি দিয়াছে। কুবুদ্ধি পরিহার করিয়া তুমি সত্যের সহজ পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। দেখিও, তোমার মন ও মাথা একটী মুহূর্ত্তে কেমন পাতলা হইয়া যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৫

পরমকল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহাশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পাকিস্থানে মুসলমানদের মধ্যে আমাদের প্রকাশিত সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোক আছেন জানিয়া প্রীত হইলাম। তুমি তোমার পত্রে যে সকল সজ্জনের বিষয়ে লিখিয়াছ, তাঁহাদিগকে আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ দিও।

তুমি একবার পাণ্ডু, একবার জলপাইগুড়ি, একবার পূর্ব্ববঙ্গ কেবলই ঠাঁই নাড়িয়া চলিতেছ। কথায় বলে, জিকা গাছটাও বারংবার স্থান-বদল করিলে মরিয়া যায়। উন্নতি করিতে চাহ ত' একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমৃত্যু-সঙ্কল্পে সেইখানেই কাজ-কারবার চালাইয়া যাইতে থাক। জেদ না করিলে লক্ষ্মী কাহারও বশীভূতা হয় না।

যেখানেই স্থায়ী ভাবে বস, চারিদিকে কোথায় কোথায় তোমাদের মণ্ডলী আছে, খুঁজিয়া বাহির করিও। চতুর্দ্দিকের মণ্ডলীগুলির সহিত

যোগাযোগ রাখিয়া আস্তে আস্তে নিজের মনের মত করিয়া আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া নিও। জল ছাড়া মাছ বাঁচে না। তোমাকে তোমার আত্মার শান্তিও প্রাণের বৃদ্ধির অনুযায়ী উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করিয়া নিতে হইবে।

চারিদিকে হাজার হাজার প্রেমিক লোক আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। কারণ, উচ্চ কলরব প্রেমের ধর্ম্ম নহে। তুমি তোমার অন্তরের প্রেম দিয়া চারিদিকের প্রেমিকদের প্রাণকে আকর্ষণ কর।

তোমার কাজ যে তোমাকেই করিতে হইবে, অন্যে আসিয়া যে করিয়া দিয়া যাইবে না, এই কথাটা ভাল করিয়া মনে রাখিও। জীবনের সব চেয়ে নিষ্প্রয়োজনীয় কাজগুলিই তোমার নিজ হাতে কর, আর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় কাজগুলির ভার পরের ঘাড়ে সঁপিয়া দাও। এই একটী মাত্র ত্রুটিতে কত আনন্দ-পারাবার নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্বার্থের কূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আশিস নিও।

প্রশ্ন করিয়াছ ভাল। জলপান বাম হস্তে করিবে, না দক্ষিণ হস্তে। বিশেষ করিয়া, সেই জলপান যদি হয় আহারের কালে।

হিন্দুগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে আমরা সদাচারী বলি, তাঁহারা আহার-কালে জলপান করিতে দক্ষিণ হস্তই ব্যবহার করেন। যে গ্লাসটা মুখে লাগিল, তাহাকে উচ্ছিষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকেন এবং মুখস্পৃষ্ট গ্লাস ধরিয়া সেই হাত আর শরীর-বস্ত্রাদিতে স্পর্শ করান না।

আহার ব্যতীত অন্য সময়ে জলপান করিতে হইলেও আমি জলপানের পরে ওষ্ঠস্পৃষ্ট গ্লাসটাকে উৎকৃষ্টরূপে মাজিয়া ধৌত করা প্রয়োজন মনে করি এবং আমার হাত আমার ওষ্ঠকে স্পর্শ না করিলেও সেই হাতটা আবার ধুইয়া ফেলি। এই আচরণের প্রথমাংশটুকু পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের সদাচারী ব্রাহ্মণের আচরণ এবং শেষাংশটুকু পশ্চিমবঙ্গের সদাচারী ব্রাহ্মণের আচরণ। আমি ইহা পালন করি দৃষ্টান্ত হিসাবে, কেননা আপাততঃ অনাবশ্যক দৃষ্ট হইলেও এই জাতীয় শুদ্ধাচারের দ্বারা ক্ষতি কিছু হয় বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

বিভিন্ন জেলায় এই সকল সদাচার সম্পর্কে প্রচলিত নিয়ম একটু আলাদা আলাদা। কিন্তু তোমরা যখন বিভিন্ন জেলার লোক একত্র হও, তখন কোন্ কোন্ অঞ্চলের মধ্যে অনুকরণীয় ব্যাপার আছে, তাহার দিকে লক্ষ্য না দিয়া কে কাহাকে কি বলিয়া হেয় করিতে পারিবে, তার দিকে নজর দাও। ইহা ক্ষতিকর।

পাশ্চাত্যদের অনুকরণে বা পাশ্চাত্য দেশ-ভ্রমণের প্রয়োজনে যখন কেহ দেশীয় সদাচার পরিহার করিতে সাময়িক ভাবে বাধ্য হয়, তখনকার বিষয় নিয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু নিজের দেশে বসিয়া থাকিয়া নিজেদের দেশের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনের

নাম করিয়া এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলের লোকের সহিত অসুন্দর আচরণ করিবে, ইহা প্রশংসার কথা নহে।

তর্কে অবশ্যই বলা যায় যে, ব্রহ্ম সর্ব্ববস্তুতে বিরাজিত, সুতরাং ডান হাতে ভাত-ডাল-রুটি-তরকারী খাইবার কালে বাম হাতে গ্লাস ধরিয়া জল খাইলে আর সেই বাম হাতটা দিয়া গায়ে মাথায় কাপড়ে জামায় স্পর্শ চালাইলে কি ব্রহ্ম অশুদ্ধ হইয়া যাইবেন? যাইবেন না নিশ্চয়ই কিন্তু এই সকল সদাচারের ত' পত্তন হইয়াছিল শারীরিক শুচিতার দিকে চাহিয়া।

তর্ক তুলিতে পার, খাবারের অংশ পড়িয়া যদি বিছানা ময়লা না করে, তাহা হইলে বিছানায় ভাতের থালা নিয়া খাইতে বসিলে ক্ষতিটা কি? সেই দিক দিয়া ক্ষতি কিছুই নাই কিন্তু দেশব্যাপী প্রচলিত সদাচারের অনুসরণ করিলেও ত' কোনও ক্ষতি নাই! এতকাল যে তোমার্ পূর্ব্বপুরুষেরা বিছানায় থালা রাখিয়া ভাত খান নাই, তাহাতে তাঁহাদের কোনও সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে কি?

তর্কবুদ্ধি দ্বারা দেশ-প্রচলিত সদাচারকে বিচার করিতে যাইও না।

প্রস্রাব করিয়া জলশৌচ প্রত্যেক সদাচারী ব্যক্তি করেন। তোমরা অনেকে তাহা কর না। আর, সেই অবস্থায়ই তোমরা ঠাকুর-মন্দিরে প্রবেশ কর, বলা বিচিত্র নয়, সর্ব্বব্যাপী ঠাকুর তোমার মলমূত্রেও কি নাই? আছেন, তবু মলমূত্র ত্যাগের পরে, বিশেষ করিয়া মলত্যাগের পরে, বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করাই সদাচার।

কেহ তোমাকে কষিয়া এক থাপ্পড় মারিয়া দিলে তুমি স্তান করিতে পার না যে পরমেশ্বরই তোমাকে থাপ্পড় মারিলেন কিন্তু

তোমার মলমূত্রে পরমেশ্বর বিদ্যমান আছেন, এই কথা জোর গলায় বলিতে তোমার বাঁধে না। ভাবিয়া দেখ, ইহা স্বতোবিরোধী কিনা।

এক এক দেশের সদাচার এক এক রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলতঃ কোন্ কারণে কোন্ সদাচারের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, জানা না থাকিলেও যতক্ষণ দেখা যাইবে যে, কোনও সদাচার পালনের ফলে কোনও গুরুতর অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, সেই স্থলে প্রচলিত সদাচারের বিরোধী কোনও কাজ না করাই ভাল।

যখন তোমরা বিভিন্ন স্থানের লোক একত্র মিলিত হইবে, তখন পরস্পর পরস্পরের কদাচারগুলি উপেক্ষা করিয়া সদাচারগুলির দিকে নজর দিও এবং যাহা যাহার সদাচার, তাহার কাছ হইতে তাহা অনুকরণ করিবে। পরস্পরের প্রতি প্রেম নিয়া এই ভাবে তোমরা মিলিত হইলে ইহার ফল হইবে বড় শুভময়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার কবিতাটি অনবদ্য হইয়াছে। প্রেমই জীবের একমাত্র উপজীব্য। যশ, ভোগ, প্রভুত্ব

মানুষকে স্ফীত বা অহঙ্কৃত করিতে পারে কিন্তু বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। বাঁচিবার পথ প্রেম। কিন্তু প্রেম তখনই পূর্ণাবয়ব, যখন তাহা নিষ্কলঙ্ক। এই জন্যই বৈষ্ণব কবিরা শ্রীকৃষ্ণকে যুবক বলিয়া চিন্তা করেন নাই। তাঁহাকে চিন্তা করিয়াছেন কিশোর রূপে। কিশোরের কাম-বিকার থাকে না, ইন্দ্রিয়ঘটিত উদ্বেগ-উত্তেজনা থাকে না। প্রেম যৌবনের প্রভাত নহে, ইহা কৈশোরের ঊষা-সমাগম, ইহাকে পুরুষ বা নারী বলিয়া আলাদা করিয়া চেনা যায় না। নারী-পুরুষের বিভেদ-বুদ্ধি ইহাতে থাকে না। যৌবন নারী পুরুষ চিনিয়া লয়, পাত্র বুঝিয়া প্রেমার্পণ করে, প্রেমের প্রতিদান চাহে, প্রেমের পরিতৃপ্তি চাহে। কৈশোরে তাহা চাহে না।

যখন যাহা লেখনীতে আসে, সব যত্ন করিয়া রাখিয়া দাও। দ্বাদশবর্ষ পরে তোমার এই খাতার মুকুরে নিজের মুখখানা দেখিও। যত তুমি নিঃস্বার্থ নিঃষ্কাম হইবে, ততই নিজেকে সৌন্দর্য্য-সুষমামিশ্রিত বলিয়া অনুভব করিবে। শুচিতা গায়ের জোরে আসে না। শুচিতা আসে অন্তরের নিষ্কাম আত্মসমর্পণ হইতে।

পাশ্চত্য যৌনরসিকরা দেহের প্রেমের সহিত প্রাণের প্রেমকে অবিচ্ছেদ করিয়া দেখিতেছেন। বৈষ্ণব কবিরাও দুইটীর ভিতর বিচ্ছেদের সীমারেখা টানিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু পাশ্চত্যের দেহের ক্ষুধা বিশ্বকে গ্রাস করিয়াছে। তাই প্রাণের ক্ষুধা দেহের ক্ষুধার সহিত অভিন্ন হইয়াছে। বৈষ্ণবের প্রাণের পিপাসা নিষ্কাম নিকষিত হেম। তাহা কামাদি সর্ব্ব-ভোগ-তৃষ্ণাকে গ্রাস করিয়াছে। ফলে, দেহের

উপরে আত্মাই হইয়াছে জয়ী, আত্মার উপরে দেহ নহে। তুমি পাশ্চাত্য প্রেমতত্ত্ব নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিতেছ। তোমাকে সাবধান হইতে হইবে। মনে করিলে চলিবে না যে, দেহ একটা যন্ত্র মাত্র, ইহা ব্যবহার করিলাম, মোবিল-কেরোসিন দিয়া ধুইয়া চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিলাম, যখন যেমন প্রয়োজন, তখন তেমন করিয়া তাহার তাগিদ মিটাইলাম। তোমার দেহমধ্যে কোটি কোটি জীবন্ত অণুপরমাণু রহিয়াছে। প্রত্যেকে চায় সার্থকতা। তোমার নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলির পরিতৃপ্তিতেই তাহাদের তৃষ্ণা মিটে না। যাহারা তোমার সমগ্র দেহখানা ধরিয়া রাখিয়াছে তোমাকে সর্ব্ববিধ পরিতৃপ্তির সুযোগ করিয়া দিবার জন্য, তাহাদিগকে অতৃপ্ত রাখিয়া কেমনে তুমি ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগ করিবে? তুমি নিজেকে লইয়াই প্রমত্ত বলিয়া ইহাদের কাহারও কথা তোমার মনে একবারের জন্যও জাগে নাই। ভাবিয়া দেখ, তুমি কত স্বার্থপর!

বসন্তহিল্লোল ব্যতীত যেমন উপবনের ফুল ফোটে না, নিষ্কাম নিঃস্বার্থ আধার ব্যতীত তেমন প্রেমের মুকুল বিকশিত হয় না। চির-প্রতীক্ষায় সে মুকুলই থাকিয়া যায়, বোঁটায় শুকায় এবং অকালে ঝরিয়া পড়ে।

হে প্রেমের কবি, অকালে ঝরিয়া পড়িও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্রে একটি কথা পাঠ করিয়া বড় প্রীত হইলাম, লিখিয়াছ, সদ্ভাবে চলিয়া যেন জীবনের উন্নতি করিতে পার। এই ঘোর কলিকালে সকলেই জীবনের উন্নতি চাহে, এখন তাহা যে কোন উপায়েই হউক। তুমি যে বাবা সদ্ভাবে থাকিয়া জীবনের উন্নতি চাহিয়াছ, ইহাতে তুমি আমাকে বিনামূল্যে কিনিয়া লইয়াছ। সততার প্রতি এই অনুরাগ আমি আমার প্রত্যেকটি সন্তানের নিকটে প্রত্যাশা করি।। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সকল সন্তান সমমনোভাবসম্পন্ন নহে।

সম্প্রতি কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানভুক্ত কতকগুলি রাজনৈতিক কর্ম্মী ও সরকারী কর্ম্মচারী সম্পর্কে জনসাধারণের মনে তীব্র উদ্বেগ ও সমালোচনার সৃষ্টি হইয়াছে শুনিতে পাই। ইহার প্রত্যুত্তরে কংগ্রেসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতৃজনের কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে শুনা গেল যে, সাম্প্রতিক কালে জনসাধারণের মধ্যে সততা ও নৈতিকতার এমনই সর্ব্বতোমুখ অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, দুই চারিজন কংগ্রেস-কর্ম্মী বা পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তি ছোট খাট দুই একটা দুর্নীর্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকিলে তাহা নিয়া এত হৈ-চৈ করিবার প্রয়োজন নাই।

আমার সন্তানদের সম্পর্কে আমার মনোভাব কিন্তু অন্যরূপ। দেশ-জোড়া দুর্নীতি চলিয়াছে বলিয়াই আমার সন্তানদের দুই একজনের

আচরিত দুর্নীতিকে উপেক্ষা করিয়া যাইতে হইবে, ইহা আমার মতে সঙ্গত নহে। কিছুকাল ধরিয়া আমি একটু উদ্বেগ বোধ করিতেছিলাম। তোমার পত্র কিছু উদ্বেগ কমাইয়াছে। তুমি চাহিয়াছ সৎপথেই যেন উন্নতি হয়। আমিও আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সৎপথেই তোমার উন্নতি হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমার পত্র পাইয়া বিস্মিত হইলাম। তুমি দীক্ষাগ্রহণকে কাণে একটি ফুঁ মাত্র বলিয়া ভাবিয়াছ। কাণে ফুঁ দেওয়া কথাটা বড়ই অশ্রদ্ধার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দীক্ষাগ্রহীতা যদি বৎসরের পর বৎসর আত্মপরীক্ষা করিয়া হৃদয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে জানিয়া তারপর দীক্ষা নিতে যায়, তাহা হইলে যেই গুরুর কাছ হইতেই সে দীক্ষা নিক্ না কেন, দীক্ষার স্বাভাবিক শুভময় ফল দীক্ষামুহূর্ত্ত হইতেই ফলিতে আরম্ভ করে, দীক্ষারূপ দ্রাক্ষালতায় ফুল না ফুটিয়াই ফল ধরে।

তুমি হয়ত তোমার গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিতে যাইবার

কালে হুজুগ ছাড়া মহত্তর কিছু প্রেরণায় যাও নাই। তাই তাঁহার দীক্ষা-দানকে কাণে ফুঁ বলিয়া মনে করিয়াছ।

যাঁহার দেওয়া দীক্ষাটাকে জীবনের অতি সাধারণ ব্যাপার বলিয়া ধারণা হইল, তাঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে যাইবার আগে নিজেকে একটু গড়িয়া পিটিয়া নিতে হইবে। গুরুর কাছে গিয়া বসিলেই গুরুসঙ্গ হয় না। তাঁহার কাছ হইতে অপরিমেয় সম্পদ আহরণের উপযুক্ত মনোভাবও থাকা চাই। যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।

অনেক গুরুদেবেরাই জীবের প্রতি হিতবুদ্ধি লইয়া দীক্ষাদান করিয়া থাকেন। কিছু গুরুর পক্ষে দীক্ষাদান একটা ধর্ম্ম-ব্যবসায় মাত্র। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই হাজার হাজার অপাত্রে দীক্ষাদান হইতেছে। ইহাতে দীক্ষার মর্যাদা কমিয়াছে।

এককালে আমি দীক্ষা দিতাম না। কিছুকাল দীক্ষা দিবার পর আবার বন্ধও করিয়া দিয়াছিলাম। পুনরায় বর্ত্তমানে দীক্ষারূপ ধর্ম্মশালার সবগুলি প্রকোষ্ঠের দুয়ার খোলা হইয়া গিয়াছে। যে আসে, তাহাকেই দীক্ষা দিয়া দেই। মনে মনে ভাবি, হতভাগারা কাহাকেও যখন বিশ্বাস করে না, তখন আমাকে বিশ্বাস করিয়া লাভবান হয় হউক। এইজন্যই আমি পারত পক্ষে কাহাকেও বিমুখ করি না।

কিন্তু দীক্ষার পরে যদি লোকে সাধন না করে, তবে আমার দীক্ষা-দানের শ্রম সফল হইবে কি করিয়া? গুরু তোমার যেমনই হউক, দীক্ষা নেওয়ার আগেই দুই এক বছর ঘাটিয়া ঘুটিয়া পরীক্ষা করিয়া নেওয়া প্রয়োজন। অথচ দীক্ষা-গৃহের দরজা হইতে কখনও

কখনও যখন দীক্ষার্থীর ভিড় কমাইয়া কিছু লোককে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতে গিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি মড়া-কান্নার উচ্চরোল শুরু হইয়া গিয়াছে।

আমার খবর ত' একেবারে টিচিং ফাঁক করিয়া দিলাম। ইহা দিয়া অন্যান্যদের খবরাখবর বোঝ।

যে যেখানেই দীক্ষা নিয়াছ, গুরুকে ভাল না লাগিলেও ঈশ্বর-সাধন ছাড়িয়া দিও না।

দিন তিনেক আগে পূর্ব্ববঙ্গের এক শ্রেষ্ঠ জমিদার-বংশের ছেলে আমার নিকটে তাহার দুঃখের কাহিনী বলিতে আসিয়াছিল। বেচারী তাহার গুরুদেবকে আনিয়া এক মাস দুই মাস নয়, তের মাস ধরিয়া নিজের প্রাসাদে রাজভোগ দিয়া বশংবদ ভৃত্যের মত সেবা করিয়াছে। পিতা, মাতা, পত্নী, কর্ম্মচারী, দাসদাসী প্রভৃতি সকলকে ঐ একটি ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত রাখিয়া যুক্ত করে, গলবস্ত্রে কম্পিত কলেবরে তেরটি মাস দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অতি তুচ্ছ কারণে হঠাৎ গুরুদেব চটিয়া গিয়া শিষ্যবংশকে অভিসম্পাতের পর অভিসম্পাতে সুধন্য করিয়া নবদ্বীপধামে চলিয়া গিয়াছেন। শিষ্যের পিতামাতা পুত্রের গুরুদেবের রোষ প্রশমার্থে তাঁহার নবদ্বীপস্থ আশ্রমে গিয়া ধর্ণা দিয়া পুনরায় লাভ করিয়াছেন নূতন নূতন অভিসম্পাত এবং অতিরিক্ত সহনাতীত অপমান।

শিষ্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, এতদবস্থায় সে কি করিবে?

আমি শিষ্যকে উপদেশ দিয়াছি,—সর্ব্বাবস্থাতেই পরমেশ্বরের সাধন চালাইয়া যাও। দীক্ষাদাতার অপ্রসন্নতা অত ভয়ের কারণ নহে। ঈশ্বরের

নামে লগ্ন হইয়া থাক। তাহাতেই গুরুদেবের রোষ জব্দ হইয়া যাইবে।

গুরুকে এদেশের লোক অশেষ সম্মান দিয়াছে। কিন্তু সাধনে মনঃসংযম যে তাহা অপেক্ষা অধিকতর মনোযোগের বস্তু, সেই দিকে দেশের জনমত তেমন সজীব নহে। হাজার স্বাধীনতার বড়াই কর, তোমরা প্রায় সকলেই জনমতের ক্রীতদাস।

আমি বলি কি জান? ভক্তি করিয়া যেই দীক্ষা নিয়াছ, তাহাকে কাণে ফুঁ নামে অপমান না করিয়া সেই সাধনে গভীরভাবে নিবিষ্ট হও। তোমার গুরুদেব দুই বছরে তোমাকে একখানাও চিঠি লেখেন নাই। ইহা ছাড়া আর ত' কোনও অভিযোগ তাঁহার বিরুদ্ধে তোমার নাই! তোমার গুরুদেব আর ত' কোনও অপ্রীতিকর কার্য্য করেন নাই! যতটুকু জানি, তিনি নিষ্কিঞ্চন নিষ্কাম সন্ন্যাসী। তোমার কাছে কোন স্বার্থ আদায়ের চেষ্টা হয়ত তিনি কখনও করেন নাই। সুতরাং বালজনোচিত চিত্তচাপল্য পরিহার করিয়া গুরুদত্ত নামের সাধনে নিষ্ঠাপূর্ব্বক লাগ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ক্ষুদ্র একটি মণ্ডলীর দুইজন প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির ভিতরে প্রেম-

প্রীতির অভাব দেখিলে লোকে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার এই ব্যাখ্যা করে যে, ইহারা প্রতিষ্ঠার লোভে রেষারেষি করিতেছে। প্রতিষ্ঠাকে বৈষ্ণব সাধকেরা শূকরী-বিষ্ঠা বলিয়াছেন। বিষ্ঠাকে মানুষ কতই না ঘৃণা করে। শূকর সেই বিষ্ঠাকে ভোজন করে। সুতরাং শূকরের প্রতি মানুষের ঘৃণা কম নহে। সেই শূকরী-বিষ্ঠা কি কাহারও আদরণীয় হইবে?

কিন্তু কোনও কোনও স্থানে মণ্ডলীভুক্ত নরনারীদের আচরণ পরস্পরের রোষ উৎপাদন করিয়া থাকে। অপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদের দোষ-ত্রুটী চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া যায়। সুতরাং গালি-গালাজ, নিন্দা-উপহাস সবই চটপট তাহার উপর প্রযুক্ত হইয়া যায়। চূনা পুঁটিরাও তখন লম্বা তিরস্কার উচ্চারণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষদের দোষ দেখিলে সকলেই তাহা আলোচনা করিতে ভয় পায়। মাতব্বরী করা ছাড়া মণ্ডলীর ভিতরে আর কোন কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে যাহাকে কেহ কখনও দেখে নাই, সেও প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষ বলিয়া সমালোচনার হাত এড়াইয়া যায়। ফলে, বদ্ধমূল রোষ অন্য রূপ ধরিয়া তাহার দিকে প্রধাবিত হয়।

তোমরা সকলে সকলকে ক্ষমা করিতে শিক্ষা কর। সকলে সকলের কাছে ক্ষমা চাহিতেও শিক্ষা কর। বড় দোষই শাসনের যোগ্য হইবে, ক্ষুদ্র দোষ উপেক্ষণীয় হইবে, এই ভাব ত্যাগ কর। বড়রা অপরাধের পর অপরাধ করিয়া যাইবে, কেহই টু শব্দ করিবে না, ছোটদের একটিবারের জন্য পান হইতে চূণ খসিলে আর ক্ষমার প্রশ্ন নাই,—এই সকল ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে। বংশে, বিদ্যায়

বা ধনে একজন সমাজ-মধ্যে সম্মানিত বলিয়াই মণ্ডলীর কাজের ভিতরে অকপট কর্ম্মী ও নিষ্কাম সেবসকেরা কোন সম্মান পাইবে না, ইহা একপ্রকারের অনাচার। ভক্তিবলে যে বলীয়ান্, ভক্তিধনে যে ধনী, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সেই সকলের চাইতে কুলীন। একজনের পাঁচতলা দালান আছে বলিয়া তাহার পাপ পাপ নয়, আর একজন কুঁড়ে ঘড়ে বাস করে বলিয়া তাহার ত্যাগ ত্যাগ নয়, এইরূপ ভাবিলে চলিবে না।

কামিনী-কুহকে অনেক পুরুষের পতন হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত নারী জাতিটাই নিন্দনীয় নহে। পুরুষের প্রলোভনে অনেক নারীর পাতিত্য ঘটিয়াছে। তাই বলিয়া পুরুষমাত্রই জঘন্য নহে। নারী ও পুরুষের ভাব ও ব্যবহারের আদান-প্রদানের মধ্যে সম্ভ্রমের একটা সীমারেখা আছে। সেই সীমারেখাটা এমন কিছু সুস্পষ্ট চিহ্ন নহে বা তাহার উচ্চতা এমন অভ্রভেদীও নহে যে, চোখ বুজিলেও তাহা দেখা যাইবে। চোখ বুজিয়া যখন নরনারী পরস্পরের সহিত মিলিতে থাকে, তখন তাহাদের অজ্ঞাতসারে কোন্ সময়ে সীমা-লঙ্ঘন হইয়া যায়, কেহ বলিতে পারে না। চক্ষু কখনও খুলিলে তখন তাহারা দেখিতে পায় যে, হাত-পায়ের মাখামাখিতে কোন সময়ে সেই রেখা মুছিয়া গিয়াছে।

সুতরাং প্রত্যেকটী সামাজিক সম্মেলনে নারী-পুরুষের মিলন-মিশ্রণের মধ্যে নিজেদের চোখ খোলা থাকা চাই।

আমরা আমাদের বাল্যকালে দেখিয়াছি, এ বাড়ীতে বিবাহ উৎসব হইলে দশ বাড়ীর ছেলেমেয়েরা অবাধ ভাবে মেলামেশা

করে, দুই তিন দিন ধরিয়া অভিভাবকদের রাজত্বের কোনও অস্তিত্বই থাকে না। আধুনিক কালের খবর জানি না। কেননা, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বিবাহ দেখি নাই। মানুষ মানুষের সহিত মিশিবে না ত' কাহার সহিত মিশিবে? পুরুষ মাত্রেই নারীখাদক আর নারী মাত্রেই পুরুষঘাতিনী, এমন অবাস্তব কল্পনার করিয়া লাভ নাই। তথাপি সাবধানতার আবশ্যকতা আছে।

সমবেত উপাসনার নাম করিয়া তোমরা যেখানে যেখানে মিলিত হও, সেখানে সকলেই সম্ভ্রমের সীমারেখার দিকে দৃষ্টি রাখিও।

কেহ কাহারও সম্পর্কে কোন ভুল-ভ্রান্তি করিলে, সঙ্গে সঙ্গে মার্জ্জনা চাহিতে ভুল করিও না। মিথ্যা আত্মসম্মানবোধ এবং ত্রুটী-সংশোধনের অবহেলা যে পরিমাণ ক্ষতি করে, অনেক সময়ে মূল অপরাধ তাহা অপেক্ষা কম ক্ষতিকর হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। বারবার হাঁড়ি-বদল করিতেছ। কোন হাঁড়িই কালো হইতেছে না। কয়মাস আগে যেখানে আসিয়াছিলে,

সেখানে আমার অনুরক্ত ভক্তগণের সংখ্যা অত্যধিক। তুমি রাজার সম্মান পাইয়াছিলে। কিন্তু কেন থাকিতে পারিলে না? কে তোমাকে সরাইয়া দিল? তোমার নিজেরই অসতর্ক কাজ-কর্ম্মগুলি নহে কি? হয়ত তুমি কাহারও প্রতি কোন অসম্মান অথবা কাহারও মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকে লক্ষ্য করিয়া কিছু কর নাই। যাহা করিয়াছ, তাহা নিতান্তই সরল স্নেহে এবং অন্তরের সহজ স্ফূর্ত্তিতে। পাপ বা অপরাধ তাহার মধ্যে হয়ত কিছুই ছিল না। কিন্তু যে আচরণকে অপরে মন্দ বলিয়া ব্যাখ্যা দিতে পারিবে, যে আচরণ হইতে কোনও মহিলা সম্মানের আঘাত কুড়াইতে সমর্থা হইবে, তেমন আচরণ তুমি করিবে কেন?

সুতরাং এবার যে তুমি ঠিক করিয়াছ যে কোনও গৃহস্থের গৃহে বাস করিবে না—নিজের পৈত্রিক বাড়ীতে বসিয়াই একটী দরিদ্র ছাত্রের সাহায্যে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি মিটাইবে, ইহা খুব ভাল বুদ্ধি হইয়াছে। সংসার মলিনতার আধার। নিজের সংসারে মলিনতা ধুইবার মুছিবার সুযোগ থাকে। পরের সংসারে গিয়া শরীরে কাদা-মাটি লাগিলে কলঘর নির্জ্জন পাওয়া যায় না। ফলে, শরীরের উপর পঙ্কের পর পঙ্ক জমিয়া পাহাড় হইতে থাকে। সাধু, যতি, ব্রহ্মচারীরা এই জন্যই গৃহস্থের গৃহে দুই একদিনের বেশী অবস্থান করেন না। ইহাকে ভীতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিও না, ইহা সতর্কতা। সতর্কতার অভাবে তুমি একটি উত্তম পরিবেশ ছাড়িয়া স্বেচ্ছায় পলাইয়া আসিয়াছ। অথচ যেখানে ছিলে, সেই উপনিবেশেই যদি থাকিয়া যাইতে, তাহা হইলে তোমার দ্বারা কত জনের কত কুশল হইতে পারিত। সেখানে তুমি কোন গৃহস্থের গৃহে ছিলে না, ছিলে নিজের গৃহে। কিন্তু তোমার আচরণের অসতর্কতা তোমাকে মানুষের

চোখে হেয় করিয়াছে, ইহাতে আমারও সম্মান কিছু বাড়ে নাই।

ভুল করিয়াছ, এখন আত্মসংশোধন কর। সেখানেও নিজ গৃহে বাস করিতে, এখানেও নিজ গৃহেই বাস করিতেছ। সুতরাং তোমার প্রয়োজন হইবে, গৃহে এবং গৃহের বাহিরে সর্ব্বত্র নিজের আচরণকে ত্রুটী-মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নিজে স্বল্পশক্তি হইয়াও সকল বৃহৎ কাজ ও মহৎ চিন্তার সহিত নিয়ত যোগরক্ষা করিয়া চলিয়াছে আমার যে দুই দশটী সুধন্য সন্তান, তুমি তাহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। তোমার নিরভিমান নিরহঙ্কার সেবা তোমাকে অপরাপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার এই চরিত্রোৎকর্ষ যেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটী পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকে।

অহঙ্কারের বিজৃম্ভণ করিয়া লোকে ভাবিয়া থাকে যে, বুঝি ইহা দ্বারা প্রভাব, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা বাড়িল। কিন্তু অহঙ্কারের মত শক্তিক্ষয়কর জিনিষ আর যে কিছু নাই, তাহা বুঝিতে পারে না।

বিনীত, বিনম্র, একাগ্র সাধকেরই পদতলে জগতের সকল শ্রেষ্ঠত্ব লুণ্ঠিত হয়। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তেমন হও।

তোমাদের সহরের নানা দিক দিয়া কৌলীন্য রহিয়াছে। আসামের ইহা একটা শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। তোমাদের গুরুভ্রাতা গুরুভগিনীর সংখ্যাও এখানে অনেক। তোমাদের মণ্ডলী ইচ্ছা করিলে শুধু সংখ্যাবলেই অল্প সময়ের আয়োজনে যে-কোনও লোকবিস্ময়কর অনুষ্ঠান করিতে পারে। পর পর কয়েকটা অনুষ্ঠানে তোমরা তোমাদের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়ও যে না দিয়াছ, তাহা নহে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনগুলির মধ্যে ইহার ফলে অসাধারণ উন্নতি কিছু আসে নাই। লোকমধ্যে তোমাদের সঙ্ঘের প্রশংসা বাড়িয়াছে, খ্যাতি ছড়াইয়াছে, তোমাদের বল ও একতা সম্পর্কে লোক-মনে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তোমরা আগে যে যাহা ছিলে, তাহা হইতে অনেক অগ্রসর, অনেক পরিমার্জ্জিত, অনেক সুন্দর হইয়া ওঠ নাই।

ইহার একটা প্রধান কারণ আত্মাহঙ্কার। অহঙ্কারকে খাটো না করিলে তোমাদের ভিতরে পরমেশ্বরের পরমলোভনীয় কান্তি ফুটিয়া উঠিবে কি করিয়া? তোমরা প্রতিজনে নিরহঙ্কার নিরভিমান প্রেমিক সেবক হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ধৃতং প্রেম্না

(৩৭)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ আশিস জানিও।

সাধুদের শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপের জন্য এক এক শ্রেণীর লোক এক এক প্রকারের মানদণ্ড ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাহারও অনুরাগীরা বলেন,—দেখ আমাদের গুরুদেবকে, তিনি ঘরে ঘরে যাইয়া নাম বিলাইতেছেন, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য যেমন করিয়া দুয়ারে দুয়ারে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ইনি তেমনি করিতেছেন, অতএব ইনি শ্রেষ্ঠ। কাহারও অনুরাগীরা বলেন,—দেখ, আমাদের গুরুদেব পাত্রাপাত্র বিচার করেন, অপাত্রে করুণা ন্যস্ত করেন না, বাছিয়া বাছিয়া দুই দশটী ভক্তের বাড়ী যান, অধিকাংশ সময়ে নিজের ঠাকুর-মন্দিরেই বসিয়া কাটান।

উদয়াস্ত-কীর্ত্তনাদি হইতে বাহিরের বাজে আড়ম্বরগুলি কমাইয়া দিয়া গায়ক ও শ্রোতাদের প্রাণের ভিতরে প্রেমের জোয়ার কিসে বাড়িবে, তাহার দিকে অধিক লক্ষ্য দাও।

মহাপুরুষ বা মহাপুরুষ নামে পরিচিত শঠ প্রবঞ্চক, কাহারও বিরুদ্ধেই তোমরা নিন্দার উদ্‌গার করিও না। কতক লোকে যাঁহাদিগকে শত অসঙ্গতি বা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মহাপুরুষ বা অবতারকল্প পুরুষ বলিয়া গণনা করে, তাঁহাদের হাঁড়ির খবর নিয়া আলোচনার প্রয়োজন তোমাদের নাই। যে-কাহারও নির্দ্দেশে বা উপদেশেই হউক, নানা

স্থানে লোকেরা যে ভগবানের সাধনে আগ্রহী হইতেছে, এই প্রীতিপ্রদ ব্যাপারটুকুকে সর্ব্বপ্রাণ দিয়া অভিনন্দিত কর।

আমাকেও মহাপুরুষ বলিয়া প্রচার করিতে তোমরা চেষ্টা করিও না। সাধারণ মানুষের মতই শ্রম করিয়া জীবন আমি অতিবাহিত করিতেছি, সাধারণ মানুষের সহিত অতি সাধারণ ভাবেই আমি মিশিতেছি, উৎসবাদির অতি-রাজসিক উচ্ছ্বাসের মাঝেও আমি সাধারণ মানুষকেই বুকে ধরিয়া শান্তি পাইতেছি, যাহারা আমার সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, তাহাদিগকে সাধারণ সমাদরেই আমি আপন করিয়া লইতেছি,—আমাকে অসাধারণ বলিয়া প্রচার করিবার মধ্যে কোনও সার্থকতা নাই। সাধারণ মানুষ সকল সাধারণ মানুষের ভিতরেই নিজেকে খুঁজিয়া পাউক, ইহার অতিরিক্ত অসাধারণ কোনও উচ্চ কামনা আমার নাই।

তোমরা গৃহে গৃহে আমার আদর্শকে প্রচার কর কিন্তু আমার পূজাকে প্রবর্ত্তন করিও না। এদেশে অনেক মহাপুরুষের পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মহাপুরুষদের নিজস্ব লাভ কিছুই হয় নাই। পরন্তু প্রত্যেকটী সাধারণ মানুষ যদি এই প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত যে, তাহাদের মধ্যে ত্রিলোক-পাবন মহাপুরুষেরা লুকাইয়া আছেন, তাহা হইলে লাভ কিছু হইত। আমি তোমাদের জনে জনের ভ্রূমধ্যে ও হৃৎকমলে থাকিয়া তোমাদের পূজা পাইতে চাহি, মন্দিরে মন্দিরে নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমাদের আশ্রয়-শিবিরের সকল মায়েদের ও শিশুদের আমার আশিস দিও।

সর্ব্ব অবস্থাতেই তোমরা ভগবানের মঙ্গলময় নামের উপরে নির্ভর করিয়া চলিও। যে অকপট প্রেমে নামের সাধনা করে, তাহার স্বভাবে এক অসামান্য মাধুর্য্যের বিকাশ হয়। তার চখে, মুখে, কথায়, ব্যবহারে নিয়তই যেন মধুর প্রলেপ লাগিয়া থাকে।

এই অবস্থা আসিলে অকারণ ঝগড়া-কলহের প্রবৃত্তি নাশ পায়।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের এক উদ্বাস্তু-শিবিরে তোমার গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের মধ্যে কর্ত্তৃত্বস্পৃহা জাগিয়া বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাইয়াছে। এই মূঢ়েরা আত্মকলহ করিয়া লোকের নিকট নিজেদের সম্ভ্রম হারাইতেছে, নিজেদের অন্তরেও নিদারুণ অশান্তির অনল জ্বলাইতেছে। একজন তার্কিক প্রকাশ্য স্থানে লোক জড় করিয়া মণ্ডলীর সম্পাদককে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছে।

এই সকল কুদৃষ্টান্তের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আসামের এই উদ্বাস্তু-শিবিরে তোমরা ঠিক বিপরীত দৃষ্টান্তের ইতিহাস সৃষ্টি কর। তোমাদের প্রেম আছে, প্রীতি আছে, বিনয় আছে। সুতরাং তোমরা তাহা করিতে নিশ্চিত সমর্থ হইবে।

আসল উদ্দেশ্য ভগবদুপাসনা। যার যার ব্যক্তিগত উপাসনা ত' ঘরে বসিয়াই করিতেছ। ইহার মধ্যে ত' আর ঝগড়া-কলহের কিছু নাই। নিজের ঘরে নিজের মনের মত করিয়া উপাসনা করিতে ত' কোনও ব্যক্তিত্ব-কর্ত্তৃত্বের প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু সমবেত উপাসনা-কালেই বা তাহা উঠিবে কেন? আসল উদ্দেশ্য ত' ভগবদুপাসনাই। সকলে এই একটী মাত্র লক্ষ্য নিয়াই ত' সমবেত হইতেছে। তবে ইহা নিয়া কেন কলহ হইবে?

তবু কোথাও কোথাও হইতেছে। নিজ নিজ নীচ স্বভাব উপাসনায় আসিবার কালে কেহ কেহ ঘরে রাখিয়া আসিতে পারিতেছে না।

তোমাদের ওখানকার উপাসনায় তাহা যেন না হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরি-ওঁ কলিকাতা
১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আশিস নিও। তোমার পত্র পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলাম।

নারী-ঘটিত ব্যাপারে বাহির হইতে গিয়া কাহারও মাথা গলানো সহজে উচিত নহে। যাহার মাতা, কন্যা বা ভগিনী, সে যদি তোমার সহায়তা না চাহে, তাহা হইলে নিজে যাচিয়া সহায়তা করিতে গেলে অনেক সময়ে প্রকৃত অপরাধী তাহার নিজের দোষের বোঝা এই

পরোপকারী সরল ব্যক্তিটির ঘাড়ে ফেলিবার সুযোগ গ্রহণ করে।

জাতির চরিত্রগত মান নীচের দিকে নামিতেছে, সৎসাহসও লোপ পাইতেছে। এমতাবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ঘটনার প্রতীকারের চেষ্টাই যথেষ্ট হইবে না, সর্ব্বব্যাপক প্রতীকার-চেষ্টা চাই।

সমাজের প্রায় সর্ব্বপ্রকার সমস্যার মূলে রহিয়াছে দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং ভগবানে বিশ্বাসের অভাব। প্রথমোক্ত দুইটী দূর করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে রাষ্ট্রের হাতে, যদিও তোমাকে বা আমাকেও সেই জন্য শ্রম করিতে হইবে। রাষ্ট্রকর্ণধারগণ নিজেদের অযোগ্যতায় অক্ষম হইলেও আমাদের চেষ্টা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি না। সক্ষম হইলেও আমাদের শ্রমদান করিতেই হইবে। ইহা আমাদের প্রতিজনের নাগরিক কর্ত্তব্য, মানবিক দায়িত্ব। কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস উৎপাদন কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার আয়ত্ত নহে। উহা তোমার আমার ভাগবতী উপলব্ধির উপরে নির্ভর করে। আমরা যদি বিশ্বাসী হই, তবেই আমরা আমাদের জীবনের সততা দ্বারা অপরকে ভগবদবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করিতে সমর্থ হইব।

নারীমাত্রেই সমাজের নিকটে এক একটা দুরূহ সমস্যা। কুমারী, সধবা, বিধবা প্রত্যেকেই এক একটা সমস্যা। কিশোরী, যুবতী, বৃদ্ধা প্রত্যেকেই এক একটা সমস্যা। কারণ, প্রেমের অমৃত-কুম্ভ থাকে ইহাদের কাঁখে। আমরা যদি ঝটিতি না পারি ইহাদের সম্পর্কিত সমস্যার মীমাংসা করিতে, সঙ্গে সঙ্গে অমৃত করে বিষে রূপান্তরিত হইবার সম্ভাবনাকে আমন্ত্রণ। যক্ষ, রক্ষ, কবন্ধ, কেহই অতি বড় ভয়ের কারণ নহে, নারী উন্মার্গগামিনী হইলে সে যাহা হয়। ব্রহ্মা,

বিষ্ণু, মহেশ্বরও অত মঙ্গলপ্রদ নহেন, নারী নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিলে সে যাহা হয়।

যে উপায়ই ধর, ভগবানের দিকে তাকাইয়া ধরিও। ভগবানকে না ভুলিয়া যাহা করিবে, তাহাই নির্ভুল হইবে। যে কাজে হাত দিতে গেলে নিজেকে ভগবদ্‌বিমুখ হইতে হয়, তাহা সৎকাজ হইলেও আপাততঃ ছাড়িয়া দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ নিও। সকলকে আশীর্ব্বাদ জানাইও।

তোমাদের গ্রামের পাশের বিরাট বাজারটাতে কম পক্ষে হাজার খানিকঅবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী আছেন। ইঁহারা বছর বছর বাড়ীতে মহোৎসব করেন এবং এক একজন পাঁচ শত হইতে পাঁচ হাজার টাকা এতদুপলক্ষ্যে খরচ করেন। তন্মেধ্যে কীর্ত্তন গাহিতে আসিয়া যাহারা পারিশ্রমিক নেন, তাহাদের বেতন শতখানিক টাকাই প্রকৃত সদ্ব্যয় হয়। বাকী টাকাটা কত লোককে খিচুড়ী খাওয়ান গিয়াছে, ফলাও করিয়া সেই কথাটা বৎসর জুড়িয়া প্রচার করিবার সুবিধা মাত্র দেয়। অন্য কোনও প্রত্যক্ষ লাভ তাহাতে গৃহস্থের বা সমাজের হয় না।

হিসাব করিয়া দেখ, ইহা নিয়মিত বার্ষিক অপচয়ের তালিকায় পড়িতে পারে কিনা।

এই জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে প্রসাদ-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। সুতরাং সবটা খিচুড়ীই যে বাজে খরচ, ইহা বলিতে যাওয়া ভুল। কিন্তু ভগবানের পবিত্র নামের মধুর ঝঙ্কার মানুষের কাণে ও প্রাণে পৌছাইয়া দিবার আয়োজনের দিকে আরও প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া খিচুড়ী প্রভৃতিকে আরও সংক্ষেপ করার চেষ্টা করা যাইতে পারে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দোষ কি? একটী দিন মাত্র হরিনাম কীর্ত্তন হইল, কেহ শুনিল, কেহ কার্য্যব্যপদেশে আটক থাকায় শুনিবার জন্য আসিতে পারিল না। কেহ প্রথম দিনে রুচি অনুভব করিল না বলিয়া শুনিতে আসিল না, দুই তিন দিন ধরিয়া নাম-কীর্ত্তন চলিলে একদিন না একদিন হয়ত আসিত, হয়ত বসিত, হয়ত শুনিত। অন্ততঃ কাহারা কাহারা আসিল না, তাহার একটু খোঁজ-খবর নিয়া, যাহারা আসিল না, তাহাদিগকে আসিবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিয়াও দেখা যাইতে পারিত।

মহতেরা নাম প্রচারের জন্য যে সকল অনুষ্ঠান প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সবই জীবের কল্যাণের দিকে তাকাইয়া। কিন্তু যুগের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, জাতিরও অর্থনৈতিক অবস্থার গুরুতর রূপান্তর হইয়াছে। এক্ষণে জীবন-সমস্যা এক অভাবনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। এই সময়ে জাতীয় অপচয় নিবারণের দিকে একটু লক্ষ্য না রাখিলে চলিবে কেন?

এই জন্যই তোমাদের বলিয়াছি যে, খিচুড়ী মহারাজকে যতটুকু

সম্মান দিতে হয় দাও কিন্তু কীর্ত্তন-মহোৎসবে তাঁহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া দিও না। নামে প্রেম বাড়ে। খিচুড়ী মহারাজ মানুষের মনে ভগবৎ-প্রেম সঞ্চারণার পক্ষে যতটুকু সহায়ক, তাঁহাকে ততটুকুই মর্য্যাদা দাও, ইহার অধিক নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১৯শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমরা সমবেত উপাসনার প্রতি ক্রমশঃ অধিক আগ্রহশীল হইতেছ জানিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হইলাম।

কিন্তু তোমরা একটা বিষয়ে বড়ই অবাধ্যতা দেখাইতেছ। ভোগ-নৈবেদ্য ব্যতীতও একমাত্র পুষ্প-বিল্বপত্রাদির দ্বারাই যেই সমবেত উপাসনা সিদ্ধ হয়, তাহাতে তোমরা বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও পক্কান্নভোগ নিবেদন করিতেছ।

বলিতেছ, মন চাহে, তাই পায়েস রাঁধিয়া ভোগ চড়াও। কিন্তু কিছুতেই বুঝিতেছ না যে, সমবেত উপাসনার মধ্যে পক্কান্ন-প্রসাদ প্রবেশ করাইলে ক্রমে ক্রমে কতগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে।

তুমি তোমার গৃহে পক্কান্ন-প্রসাদের ব্যবস্থা করিলে। সমবেত উপাসনায় তোমার সম্প্রদায়ের লোক ছাড়াও অনেকে আসিয়া থাকেন।

তাঁহাদের রুচি ও প্রবৃত্তির বাহিরে হওয়াতে তাঁহারা এই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা মনে মনে ভাবিলেন, তোমরা তাঁহাদিগকে ডাকিয়াছিলে তাঁহাদের প্রচলিত নিষ্ঠা ভাঙ্গিয়া তাঁহাদিগকে অপ্রস্তুত করিবার জন্য, আর তোমরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলে এই ভাবিয়া যে, নাস্তিক পাষণ্ডরা তোমাদের পূজার প্রসাদের অবমাননা করিল।

তুমি চাউল বা ডাইলের পক্কান্ন ভোগ দিয়াছ দেখিয়া তোমার জনৈক রিয়াং গুরুভ্রাতা কুক্কুট-মাংস রান্না করিয়া ভোগ চড়াইলেন, তোমার এক মুচি গুরুভ্রাতা মহিষ-মাংস দিয়া ভোগ সাজাইলেন, তোমার এক পশুপালক ভ্রাতা শূকর-মাংস নিবেদন করিলেন। তোমার আর এক লুসাই ভ্রাতা ইহা অপেক্ষাও দুষ্পচ্য কোন্ মাংস রাঁধিয়া ভোগ চড়াইলেন, তাহার আর নামোল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে?

সনাতনী হিন্দুরাও তোমাদের উপাসনায় যোগ দিতে আসেন এই ভাবিয়া যে, শাস্ত্রের সারকে তোমরা মন্ত্ররূপে ধরিয়াছ। তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করিবেন যে, কাহারও জাতি মারিবার বা পাত তুড়িবার কুবুদ্ধি তোমাদের নাই।

তোমরা কোনও দেব-দেবীর প্রতিমার পূজা কর না বলিয়াই অনেক মুসলমানও শুদ্ধ চিত্তে পরিস্নাত দেহে তোমাদের উপাসনায় যোগ দিতে আসেন।

অনেক খ্রীষ্টানই শুনিয়াছেন যে, যেই শব্দ আদিতে ছিলেন এবং যেই শব্দের সহিত ভগবান ছিলেন অভিন্ন, সেই শব্দকে প্রণব বলিয়া জানিয়া তোমরা উপাসনা করিয়া থাক। তাই তাঁহারাও তোমাদের উপাসনায় দ্বিধা পরিহার করিয়া যোগ দিয়া থাকেন।

ভোগের প্রসাদে পক্কান্ন আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সনাতনীরা ক্ষুব্ধ হইবেন, মুসলমান ও খ্রীষ্টান নিজেদের প্রতি সনাতনীদের ঘৃণার নূতন করিয়া পরিচয় পাইয়া বিরক্ত হইবেন। যেখানে ছিল অনাবিল শান্তি, সেখানে সৃষ্ট হইবে অযথা কলহ ও মনান্তর।

দলাদলি করিয়া কাজ পণ্ড ত' তোমরা দেড় দুই হাজার বছর ধরিয়া করিয়া আসিতেছ। সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া যেখানে গলাগলির সুরু হইয়াছিল, সেখানে অবুঝ ও মতলবী আচরণের দ্বারা কেন তোমরা গালাগালির ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিবে?

কাহারও অন্নপ্রাশন করিতে চাহ, বেশ ত'! সমবেত উপাসনায় নিবেদিত কোনও মিষ্টদ্রব্য নিয়া অন্নের সহিত মিশাইয়া শিশুর মুখে দাও। তাহাতেই অন্নপ্রাশন হইয়া যাইবে।

সমবেত উপাসনা সম্পর্কে তোমরা আরও একটী জরুরী নির্দ্দেশ নিয়ত অপালন করিয়া চলিয়াছ। সমবেত উপাসনা যাহার বাড়ীতেই হউক, যে উপলক্ষ্যেই হউক, যোগদান করিতে যাইবার কালে তুমিও নিজ হাতে করিয়া ফল-মূল অথবা পুষ্প-বিল্বপত্র কিম্বা দুর্ব্বা-তুলসী আদি নিয়া যাইবে এবং ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সকল অনুষ্ঠানের সঙ্গেই তোমার প্রকৃত যোগ রক্ষা করিবে। কেবল কণ্ঠ দ্বারা স্তোত্রাদি পাঠেই নহে, উপাসনার উপকরণাদি বিষয়েও তোমাদের স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগ এই সমবেত উপাসনারই একটী বিধিবদ্ধ নিয়ম। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, আরোগ্য-কামনা, শুদ্ধভক্তি-কামনা প্রভৃতি যে-কোনও উপলক্ষ্য করিয়াই সমবেত উপাসনা হউক এবং যাহার গৃহেই হউক, সহযোগ তোমাদের প্রত্যেকের করণীয়। আমার পিতার শ্রাদ্ধ বলিয়া আমি

তোমার সহযোগ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিব না। তোমার পুত্রের বিবাহ বলিয়া তুমি আমার সহযোগ ফিরাইয়া দিতে পারিবে না। পরমশত্রুর গৃহেও যদি সমবেত উপাসনা হয় আর তোমার যোগদান করিবার পথে বাধা না থাকে, তাহা হইলেও তোমাকে অল্পাধিক পরিমাণে উপাসনার সহায়ক কিছু না কিছু উপকরণ নিয়া যাইতে হইবে। ইহাই সমবেত উপাসনার সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম।

শ্মশানে এবং সংক্রামক রোগীর গৃহে সমবেত উপাসনা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার ভোগ-নৈবেদ্য-বর্জ্জিত ভাবে কাজটী করিতে হইবে। এই নিয়মটীকেও তোমরা বারংবার অগ্রাহ্য করিতেছ।

নিয়মই যদি মানিবে না, তবে আর সমবেত উপাসনার নাম দিয়া মানুষ জড় করা কেন? সমবেত উপাসনাই ছাড়িয়া দাও।

নগরসঙ্কীর্ত্তন কালেও লক্ষ্য করিতেছি যে, তোমরা চিরপ্রচলিত কুপ্রথার দাসত্ব ছাড়িবে না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া বসিয়া আছ। পূর্ব্বকালে নগর-সঙ্কীর্ত্তন-কালে পথে পথে বাতাসার লুট দেওয়া হইত। ছেলেমেয়েরা ভক্তজনেরা মাটি হইতে বাতাসা কুড়াইয়া নিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া খাইত ও খাওয়াইত! কিন্তু যেই যুগে এই প্রথার প্রচলন হইয়াছিল, সেই যুগে ঘরে ঘরে যক্ষারোগ ছিল না, পথে ঘাটে লোকেরা থুথু ফেলিত না বা মলত্যাগ করিত না, জগতে জনসংখ্যা ছিল অনেক কম এবং শুধু বায়ু আর রৌদ্রের প্রতাপে পথ, ঘাট, মাঠ শুদ্ধ হইয়া যাইত। তদুপরি স্বাভাবিক জীবন-যাপনের অভ্যাসহেতু জনসাধারণের রোগ-নিবারণী ক্ষমতা ছিল অধিক। তখন হয়ত মাটি হইতে কুড়াইয়া লুটের প্রসাদ খাইলে ব্যাধি হইত না কিন্তু আজ তাহা হয়। আজ আমাশয় রোগ সর্ব্বনাশকর ব্যাপকতা পাইয়াছে এবং

খাদ্যের সহিতই আমাশয়ের বীজাণু সংক্রামিত হয়। সুতরাং আজ সকল ব্যাপারেই স্বাস্থ্যতত্ত্বানুগত হইয়া চলিবার চেষ্টা করা উচিত।

বারংবার আমি কহিয়াছি, রাস্তার ধূলায় প্রসাদ ছুঁড়িয়া দিও না, মাটি হইতে তুলিয়া নিয়া যেই প্রসাদ জলে ধুইয়া গ্রহণ করা সম্ভব নহে, তাহা হাতে হাতে দাও,—কিন্তু তোমরা শুনিতেছ না। উৎসাহ তোমাদের অত্যধিক কিন্তু ইহা কি অনুচিত উৎসাহ নহে?

সমবেত উপাসনার প্রসাদ-বিতরণ কালে বিতরণকারী ও গ্রহণকারী উভয়ের হস্ত-প্রক্ষালণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। বারাণসী ও কলিকাতা আশ্রমে আমরা তাহা করি। মূল গুরুধামে যাহা হয়, তোমরা বাহিরে তাহার অনুসরণ কর না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। প্রসাদ-গ্রহণ-কালের কল-কোলাহল সমবেত উপসানার দ্বারা লব্ধ চিত্তস্থৈর্য্য ও আনন্দটুকুকে মাটি করিয়া দেয়। হৈ-চৈ করিয়া প্রসাদ গ্রহনের মধ্যে এক প্রকারের আনন্দ যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু সেই তুচ্ছ আনন্দের লোভে সমবেত-উপাসনা-লব্ধ আনন্দকে বলি দেওয়া যায় না। এবার আমি আগরতলা গিয়া জোর করিয়া বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে সকল উপাসক ও উপাসিকাদের লাইন করিয়া বসাইয়া সুশৃঙ্খল ভাবে ও নীরবে প্রসাদ নিতে বাধ্য করি। প্রতি স্থানে যাইয়া আমি- কেবল জোর-জবরদস্তি করিয়াই তোমাদের কর্ত্তব্য তোমাদের দ্বারা করাইব, এত অবসর ত' বাবা আমার নাই। একটী স্থানের ব্যাপারে কোনও কিছু শৃঙ্খলা-বিধান ঘটিলে তাহা তোমাদের নিজেদের গরজেই ত' অনুসরণ করা প্রয়োজন।

সমবেত উপাসনা পরকে আপন করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সকলের প্রতি প্রেম, সকলের প্রতি সুবিচার, সর্ব্বপ্রযত্নে কলহ-

সম্ভাবনা-বর্জ্জন হইবে ইহার মূল ভিত্তি। তোমরা এই আসল কথাটি ভুলিয়া গিয়া হট্টগোলের মধ্য দিয়া প্রকৃত প্রাপ্য হারাইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরি-ওঁ কলিকাতা

১৯শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের অনেককেই আমি আগরতলায় প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্তু পাসপোর্ট-ভিসার গোলমালে যাইতে পার নাই। অনেকেই পারে নাই। তবু যে অল্প কয়জন গিয়াছে, তাহাদের প্রাণের প্রেম আমার নিকটে গভীর সমুদ্রের মত অদ্ভুত ঠেকিয়াছে। বিরহে প্রেম বাড়ে বলিয়া যে একটা কথা আছে, আমার পূর্ব্ববঙ্গবাসী পুত্র-কন্যাদের সম্পর্কে সে কথা সম্পূর্ণ সত্য হইয়াছে। তুমি নূতন জায়গায় চাকুরী নিয়া গিয়াছ। ভালই করিয়াছ। নূতন নূতন স্থানে যাইয়া নূতন নূতন ভ্রাতাভগিনীদের সহিত পরিচয় হইতেছে। এই পরিচয় তোমার ও তাহাদের সর্ব্বতোমুখ কুশল বৃদ্ধি করুক।

মানুষ মানুষের সহিত যখন স্বার্থের খাতিরে সন্নিহিত হয়, তখন পরস্পর পরস্পরের কুশল অত্যল্পই করিতে পারে। কিন্তু যখন ঈশ্বরের সেবাকে লক্ষ্য রাখিয়া ঈশ্বরের সন্তান ঈশ্বরের সন্তানের সহিত মিলিত হয়, তখন বিনা চেষ্টায় একে অপরের হিতসাধন

করে। তোমরা ঈশ্বরে ঈশ্বর-মুখী হইবার জন্য বারংবার মিলিত হও এবং পৌঁছিয়া তোমরা পরস্পরের সহিত অভিন্ন হও।

কেহ কেহ পরিচয়-প্রদান-সূত্রে বলিয়া থাকে, "অমুক আমার ধর্ম্মভ্রাতা বা গুরুভাই।" কিন্তু ধর্ম্মে তাহারা মিলন-সাধন করিল না, গুরুর ভিতর দিয়া তাহারা এক হইল না, এমতাবস্থায় জোর গলায় ভাই বলিয়া পরিচয় দিলেই কি কেহ ভাই হয়?

দুই ধর্ম্মভ্রাতা মিলিয়া যখন নিজ ধর্ম্মের নিন্দা করে, দুই গুরুভ্রাতা মিলিয়া যখন গুরুদেবের ছিদ্রান্বেষণে মনোযোগ দেয়, তখন কি তাহারা পরস্পর ভ্রাতা থাকে? তখন যে তাহাদের ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ লোপ পাইয়া যায়। তখন যে তাহারা পরস্পরের কুসঙ্গীতে পরিণত হয়। তখন যে তাহারা একের সান্নিধ্যের মধ্য দিয়া পাপ, অপরাধ এবং অশান্তিই শুধু সংগ্রহ করে। ভ্রাতৃত্বের হইয়া যায় চির-সমাধি।

ধর্ম্মসঙ্ঘের একত্বের দিক দিয়া যাহারা পরস্পর গুরুভ্রাতা নহে অর্থাৎ একই গুরু-পরম্পরা যাহাদের নাই, তাহারাও যদি পরস্পরের সঙ্গ দ্বারা নিজ সাধনে রুচি অধিক পায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ইহারা প্রকৃত ধর্ম্মভ্রাতা বা গুরুভাই।

নিজ মত-পথের নিন্দা শুনাইবার জন্য প্রকৃত গুরুভ্রাতা তোমাকে সঙ্গ দিতে আসিবে না। যে মন্দ শুনাইবার জন্য আসিবে, সে গুরুভ্রাতার ছদ্মবেশধারী শত্রু। ইষ্টনিষ্ঠা হ্রাসে যাহার চেষ্টা, সে চোর-ডাকাত অপেক্ষাও মারাত্মক। বিষধর ভুজঙ্গ জানিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিবে।

পরস্পর গুরুভাই বলিয়া পরিচয় দিয়া যাহারা নিজেদের মধ্যে

আর্থিক আদান-প্রদান সৃষ্টি করে এবং অবিচল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়া করে একে অন্যকে প্রতারণা, তাহাদিগকেও গুরুভ্রাতা বলিয়া জ্ঞান করা অনুচিত। সঙ্গ-বর্জ্জনের দ্বারা তাহাদিগকে আত্মসংশোধনের সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং সংশোধিত-চরিত্র হইয়া আসিলেই পূর্ব্ববৎ পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন সঙ্গত। মাতা তাঁহার দুষ্কৃতিকারী পুত্রকে যে স্নেহ দিয়া শাসন করেন, সেই স্নেহ এই শাসনে থাকা চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরি-ওঁ কলিকাতা
২৩শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। ভক্তিযুক্ত প্রাণে যে প্রণাম করে, তার প্রণাম দেহ-মনঃ-প্রাণ শীতল করে। দূর হইতেও সেই প্রণামের পরমসুখপ্রদ স্নিগ্ধ স্পর্শ পাওয়া যায়।

যেখানে একটী প্রাণীও ভক্তিযুক্ত চিত্তে প্রণত হইয়াছে, সেখানে তাহার অন্তরের কোমল স্পর্শ চারিদিকের বহু উদ্ধত ব্যক্তির মনের বিনয়-নম্রতা আনয়ন করে।

যেখানে প্রণাম একটা প্রথা বা লোকাচার মাত্র, সেখানে প্রণামের এই প্রভাব প্রসারিত হয় না।

তোমাদের জীবনের প্রতিটি স্তুতি, প্রতিটি প্রণতি অর্থযুক্ত এবং

অকপট হউক। প্রণাম তোমাদের অন্তরের মহিমাকে খর্ব্ব না করিয়া করুক অভ্রভেদী ও সমুন্নত।

আমাকে কবে দেখিবে, তাহা ভাবিয়া উতলা হইও না। পরমেশ্বর আমার রূপ ধরিয়া তোমাদের কাছে আসিয়াছেন, এই বিশ্বাস যদি আন্তরিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোটি কোটি বুভুক্ষিত পিপাসিত দীন দুঃখীর মূরতি ধরিয়া আমিই তোমাদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এই কথা বিশ্বাস করিতে তোমাদের কষ্ট হওয়া উচিত নহে। বিশ্বাস কর, আমাকে বিপুল পরিমাণ পাদ্য, অর্ঘ্য, ভোজ্য, পানীয়, ধন, সম্পত্তি, পূজা ও আরতি দিলেই আমার পূজা হয় না, আমাকে পূজিতে হইলে তোমার গৃহের চারিদিকে অবস্থান-কারী সকল অভাবীর অভাব তোমাদের মোচন করিতে হইবে।

সকল অভাবের সেরা অভাব জ্ঞানাভাব। ধনবান অজ্ঞানতা বশতঃ ধনের অপব্যবহার করে। স্বাস্থ্যবান অজ্ঞানতাবশতঃ বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, মনীষার অপব্যবহার করিয়া জগতের অকুশল অশান্তি অসুখ অস্থৈর্য্য বৃদ্ধি করে। এই কারণে অকাতরে জ্ঞান বিতরণই জগতের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। তোমরা লোকের অভাব দূর করিতে সমর্থ হও আর না হও, যার যেটুকু অজ্ঞানতার অভাব দূর করিতে পার, তার চেষ্টা তোমরা কর।

অপরের অজ্ঞানতা দূর করিতে হইলে নিজেকেও জ্ঞাননিষ্ঠ হইতে হয়। এই একটী কথা মনে রাখিলেই দেখিবে, কাজে কোথাও ভুল হইতেছে না। জ্ঞানীদের সঙ্গ কর, জ্ঞানীদের কথিত বা লিখিত উপদেশ-বাণী পাঠ কর, জ্ঞানীদের জ্ঞানপ্রদ বাক্যগুলির চিন্তনানুচিন্তনের দ্বারা অন্তরের স্বচ্ছতা ও সবলতা বর্দ্ধন কর।

তখন দেখিবে, অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযান কত শক্তিশালী হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের ওখানকার শ্রীযুক্ত—দত্ত মহাশয়—মঠের স্বামীজীদের শিষ্য। ইহাই ত' স্বাভাবিক যে, তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ঐ একই মঠের আচার্য্যদের কাছে দীক্ষা নিবেন। স্বামী এবং স্ত্রীর ধর্ম্ম-সাধনার পথ এক ও অভিন্ন হইলে দুই জনেরই অগ্রগতি সহজে হয়। আর, দুইজনের একই মতে দীক্ষা নিবার ফলস্বরূপে পরস্পরের প্রতি প্রেমভাব বর্দ্ধনেরও সহায়তা হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া শ্রীমতী বী—'র পুনরায় স্বামীর গুরুদেবদের নিকট দীক্ষা নেওয়া সঙ্গতই হইয়াছে।

তোমরা এই ব্যাপার নিয়া বৃথা মনঃক্লেশ নিও না। এই ব্যাপারকে দৈনিন্দিন আর পাঁচটা সাধারণ ঘটনার মত মনে করিয়া ভুলিয়া যাও। নিজ আধ্যাত্মিক কুশল সম্পাদনের জন্য যে-কোনও ব্যক্তির দীক্ষা-মন্ত্র বা গুরু পরিবর্ত্তনের অধিকার আছে। যদি সাধন-জীবনে উন্নতি লাভই তাহার লক্ষ্য হইয়া থাকে এবং পুনরায়

স্থানান্তরে মন্ত্রান্তরে দীক্ষা নিয়া সেই উন্নতির পথে ধাবিত হইবার আমৃত্যু সঙ্কল্প থাকে, তবে ইহা দ্বারা সাধক লাভবানই হয়। আমার কিছু শিষ্য কমিয়া গেল, অন্য কাহারও শিষ্য বাড়িল, এই দৃষ্টি দিয়া এই সকল ঘটনাকে দেখা উচিত নহে।

আমি ত' কাহাকেও সাধিয়া আনিয়া দীক্ষা দেই না। দত্ত মহাশয় নিজেরই গরজে নিজ পত্নীকে আমার কাছ হইতে দীক্ষা নেওয়াইয়াছিলেন। এখন যদি তিনি নিজের গুরুদেবদের নিকটে তাঁহার পত্নীকে নিয়া থাকেন, তবে ত' তাহা ভালই করিয়াছেন। এমনও কি হইতে পারে না যে, দত্ত মহাশয় যেই ধর্ম্মসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত, সেই সঙ্ঘের অনেকে সম্প্রতি যে ভাবে অন্যান্য ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতি প্রায় প্রতি স্থানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অসহিষ্ণুতার ভাব প্রদর্শন করিতেছেন, তাহারই ফলে দত্ত মহাশয় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কার্য্যটী করিতে বাধ্য হইয়াছেন? এইরূপ কত কারণ থাকিতে পারে, যাহা হয়ত দত্ত মহাশয়ের আয়ত্তের বাহিরে। কিন্তু স্বেচ্ছায় যে দম্পতি দুই গুরুর শিষ্য ছিলেন, স্বেচ্ছায়ই তাঁহারা যদি এক গুরুর বা এক গুরু-পরম্পরার শিষ্য হইয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাদের আপত্তি করিবার কোন্ যুক্তি থাকিতে পারে? তোমাদের মণ্ডলীর সভ্যদের মধ্য হইতে একজন ধনবতী সদস্যা দূরে সরিয়া গেলেন বলিয়া তোমরা ম্রিয়মান হইবে, ইহা আমি তোমাদের পক্ষে কলঙ্ক-জনক মনে করি। ধনবানের বা তাঁহার ধনের মর্য্যাদা তোমাদের নিকটে নাই। মানুষেরই ত' যত মর্য্যাদা। ধনবানগণকে নিজ ধর্ম্মসঙ্ঘের মধ্যে পাইবার জন্য যখনই চেষ্টা হয়, তখনই ইহার

সহিত সঙ্ঘে অনেক দুর্ব্বলতা প্রবেশ করে। দুনিয়ার যত গরীব-দুঃখীকে তোমরা তোমাদের গুরুভাই গুরুভগ্নী রূপে লাভ করিয়াই আনন্দ কর, তাহাদের ভিতরে মনুষ্যত্বের উদ্দীপনা সৃষ্টি করিবার জন্য তোমরা বরং তোমাদের তুচ্ছ সম্বল, স্বল্প বিত্ত, ক্ষুদ্র আয় ব্যয়িত কর। মণ্ডলীর একজন চাঁদা-দাতা কমিয়া গেলেন বলিয়া দুঃখ করা ত' অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর।

যে যেখানে গিয়া যেই ভজন-প্রণালী আশ্রয় করিয়া ভগবানকে ডাকুক, তোমাদের তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। একজন মুসলমান ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে একদা তাহার নাম হইত মুনাফেক এবং প্রাপ্য হইত প্রাণদণ্ড। কিন্তু সেই রীতি এই যুগে চলিবার জন্য নহে। যাহার যেখানে সাধন করিতে ভাল লাগিবে না, ভাল করিয়া সাধন করিবার জন্যই সে সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে পারে। তোমরা তোমাদের ধর্ম্মসঙ্ঘে একটী প্রাণীকেও আমন্ত্রণ করিয়া নিয়া আস না, সুতরাং কেহ স্বেচ্ছায় ও সাধুবুদ্ধিতে অন্যত্র চলিয়া গেলে জোর করিয়া তাহাকে বাধা দিতেও ত' পার না। আর, বাধা দিয়া লাভই বা হইবে কি? তোমরা যাহারা বারংবার মত, পথ ও মন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিয়া চলিতে রাজি নহ, তাহারা যদি নিবিড়, গভীর, একাগ্র ভাবে নিজেদের সাধন করিয়া যাইতে থাক, তাহা হইলে চুম্বকের মত আকৃষ্ট হইয়া সহস্র সহস্র নরনারী ফন্দী-ফিকির-নিরপেক্ষ হইয়া তোমাদের কোলে চলিয়া আসিবে। যদিও ধর্ম্মসঙ্ঘের আয়তন-বৃদ্ধি তোমাদের লক্ষ্য নহে এবং হইতে পারে না, তথাপি ইহাই স্বাভারিক। তাই বলিতেছি যে, তোমাদের সঙ্ঘ হইতে দূরে

সরিয়া যাওয়া কেহ লাভজনক বা প্রয়োজন মনে করিয়াছে বলিয়াই তোমরা তাহাকে পর মনে করিতে পার না বা তাহার আচরণ লইয়া বিক্ষুব্ধ, বিত্রস্ত, ব্যাকুল হইতে পার না।

মণ্ডলীর তোমরা আরও কত সভ্য আছ। বিচার করিয়া দেখ ত', সকল সভ্যেরাই সাধন করিতেছে কিনা। নাকি, অধিকাংশেই নামকে-ওয়াস্তে অখণ্ড পরিচয় দিয়া সাধন-ভজন সিকায় তুলিয়া রাখিয়াছে? এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অনুসন্ধান করিলে হয়ত এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইবে যে, এভাবে বৃথা ভড়ং করিয়া একটা দল-বিশেষের মধ্যে না থাকিয়া "সাধন করিবই করিব" এই প্রতিজ্ঞা লইয়া সঙ্ঘান্তরে যোগদান করা শ্রেয়ঃ কর্ম্ম। তোমরা যাহারা প্রাপ্ত দীক্ষাকে কোনও অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিবে না বলিয়া অন্তরে প্রত্যয় পাইয়াছ, তাহারা একবার কঠোর সঙ্কল্প করিয়া সাধন-সমুদ্রে ডুব দিবার চেষ্টা করিয়া দেখ না কেন? সৎকাজের ফল সৎ, সাধন করিবার ফল সিদ্ধি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখী হইলাম। তোমার বিবাহ সংবাদে

আনন্দিত হইলাম। এতদিন চাকুরী করিয়া পিতৃমাতৃ-সেবা করিয়াছ, এখন হইতে সর্ব্বশক্তি দিয়া স্বামীর সেবা করিবে। উভয় জীবনই তোমার সেবার জীবন। যে সেবা করে, জগতে সে বন্দনীয়। সেবাবুদ্ধি নিয়া সংসারের প্রতিটি কাজ করিও। সেবায় যে আনন্দ, কর্ত্তৃত্ব-পরিচালনে সেই আনন্দ নাই।

নূতন সহরে আসিয়াছ, নূতন সংসারে ঢুকিয়াছ। এই সহর ও এই সংসার, উভয়ই তোমাকে আপন করিয়া নিতে হইবে। সন্ধান লও, ইহাদের ভিতরে কোথায় কি আছে মহৎ, কি আছে শ্রেষ্ঠ। তাহার প্রতি কর অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ। আর তোমার জীবন-কুম্ভে ভগবৎ-প্রেমের যে মধু হইয়াছে এতকাল নাম-সাধনের ফলে সঞ্চিত, তাহা এই সহরে এবং এই সংসারে করিতে হইবে অকুণ্ঠিত চিত্তে অকৃপণ হস্তে বিতরণ। তাহা হইলেই সকল পর আপন হইয়া যাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরি-ওঁ
কলিকাতা
২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা যে যেখানে যেই অবস্থায় বা যে জীবিকা অবলম্বন করিয়া আছ, প্রত্যেকেরই যে জীবিকার্জ্জনের চেষ্টার অতিরিক্ত কতকগুলি

কর্ত্তব্য আছে এবং সেই কর্ত্তব্য জগতেরই প্রতি, এই কথা একজনেও বিস্মৃত হইও না। এই কর্ত্তব্যের প্রতি তোমাদের অনুরাগ যাহাতে প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর হয়, তাহারই জন্য যে তোমাদের অনুক্ষণ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ইহাও ভুলিও না। যে আছে যেখানে যে-কোনও দিক দিয়া তোমাদের অপেক্ষা ছোট বা হীন, তাহাকে বড় হইবার সহায়তা তোমাদের করিতে হইবে। আবার, যে আছে যেখানে তোমাদের অপেক্ষা বড় বা মহৎ, তাহার মতন হইবার জন্য তোমাদের আপ্রাণ সাধনা করিতে হইবে। ছোটকে বড় করা, নিজেরা বড় হওয়া, এই দুইটী চেষ্টার যুগপৎ প্রয়োগের মধ্য দিয়াই জগতের সকল অসাম্য দূর করিতে হইবে। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের মহিমা-প্রচারে তোমাদিগকে অকুতোভয়, অনলস ও উদারবুদ্ধি হইতে হইবে।

—বাজার বোধ হয় তোমাদের চা-বাগিচা হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে হইবে। সেখান হইতে তোমার ভ্রাতা শ্রী—এক পত্রে জানাইয়াছে যে, সেখানে এগার শত নরনারী দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। এইরূপ ব্যাপক দীক্ষা আজকাল আমাদের কোথাও কোথাও হইতেছে এই কারণে তাহার প্রদত্ত সংবাদ ভিত্তিহীন বা অলীক বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। কিন্তু আমার মনে যে প্রশ্নটী জাগিয়াছে, তাহা এই যে, এতগুলি লোক মন্ত্রদীক্ষা লইয়া তোমাদের সমগোত্রীয় হইলেই কি তোমরা লাভবান্ হইয়া যাইবে? দীক্ষা লইল, সাধন করিল না,—তাহারা কি সমাজের শক্তি? দীক্ষার মানে হইতেছে, উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনের পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ এবং সেই সঙ্কল্পানুযায়ী চলিবার জন্য কঠোর প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হওয়া। সঙ্কল্প

করিব কিন্তু কাজ করিব না, প্রতিজ্ঞা করিব কিন্তু পালন করিব না,—ইহা কিরূপ ব্রত?

এই স্থানে দীক্ষা কথাটাকে তোমাদের ভাল করিয়া বুঝিয়া নিতে হইবে। বর্ত্তমান বিচার-বিতর্ক-প্রধান যুক্তির যুগে গুরুদেবগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত দীক্ষা শিষ্যদলকে ক্রীতদাসরূপে তালিকাভুক্ত করার সামিল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। শিষ্যদলের শ্রমার্জ্জিত বিত্ত বিনা শ্রমে অপহরণ করিবার জন্য গুরুদেবগণ দীক্ষারূপ একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া সহজ-বিশ্বাসপ্রবণ ও দুর্ব্বল-হৃদয় ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মের নামে ঈশ্বরের দোহাই দিয়া প্রতারণা করিয়া আসিতেছেন বলিয়া শতকরা পঞ্চাশ জন লোক আজ অভিযোগ করিতেছে। যুক্তিবাদীদের এই অভিযোগ অনেক স্থলে যে সত্য, তাহাও না মানিয়া পারা যাইবে না। গুরুদেবগণ বা তাঁহাদের দালালেরা বাছিয়া বাছিয়া ধনী, মানী ও বড়লোকদের দীক্ষিত করিবার জন্য যেমন নিদারুণ পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তাহা হইতে যুক্তিবাদীদের অভিযোগ অনেকটা সমর্থিত হইয়া যায়। এমন এক যুগে তোমরা যদি তোমাদের গুরুভ্রাতা সংগ্রহের চেষ্টাকে প্রাধান্য দিতে যাও, তাহা হইলে তোমরাও যে বহু সরল ও সততা-পরায়ণ যুক্তিবাদীর সমালোচনার বিষয় হইবে, ইহা নিশ্চিত। এই কারণেই তোমাদের মুখে যখন উল্লাস-ধ্বনি শুনি যে, অমুক স্থানে একদিনে তোমাদের এত শত গুরুভাই হইল, তখন ভাবিতে ইচ্ছা করে যে, দীক্ষা কথার মানে তোমরা ঠিক-মত বুঝিয়াছ ত'?

তোমাদের দীক্ষা ভগবানের কোনও নামকে নির্দ্দিষ্ট কোনও

প্রণালীর মধ্য দিয়া সাধন করিবার সঙ্কল্পটুকু গ্রহণই মাত্র নহে, তোমাদের সমস্ত সাধনা যে জগন্মঙ্গলেরই জন্য, এই সঙ্কল্পকেও গ্রহণ করা। তোমার দেহ, মন, প্রাণ, আত্মাকে জগন্মঙ্গলের জন্য প্রস্তুত করিবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টাকে নিয়ত অন্তরে জাগরিত করিয়া রাখিবার নিরলস উদ্যামের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ হইতেছে তোমার দীক্ষা। দেশ-প্রচলিত সকল রকমের দীক্ষা হইতে তোমার দীক্ষার লক্ষ্য ও প্রণালীর মধ্যে এই একটী বিরাট বিশিষ্টতা রহিয়াছে। তোমাদের দীক্ষা কেবল মন্ত্রদানই নহে, কেবল মন্ত্রগ্রহনই নহে। তোমাদের দীক্ষা জগৎ-কল্যাণের উদগ্র, একাগ্র, একান্ত ব্রতগ্রহণ।

এই কারণেই দীক্ষা গ্রহণের আগে তোমার ভাবী গুরুভ্রাতাদের প্রয়োজন হইতেছে দীক্ষার জন্য উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হওয়া। যে গুরু শিষ্যদের নিকটে গুরুপ্রণামী দাবী করিলেন না, যে গুরু শিষ্যদের নিকট হইতে বার্ষিক প্রার্থনা করিলেন না, যে গুরু শিষ্যদের ডাকিয়া বলিলেন না, "তোদের নিজের উদরে অন্নগ্রাস দিবার আগে আমার উদরের অন্নগ্রাস আলাদা করিয়া রাখ", যে গুরু সমগ্র জীবন কঠোর কৃচ্ছ্র সহিয়া কোদাল-গাইতি হাতে কঙ্করময় কঠোর প্রস্তরাকীর্ণ মৃত্তিকা কেবল কাটিয়াই যাইতেছেন, তোমাদিগকে ভগবানের নামে দীক্ষিত করিবার মধ্যে তাঁহার প্রয়োজন-বোধটা কোথায়, তাহা তোমরা ভাবিয়া দেখ।

তোমরা দীক্ষা নিবে আর তারপরেও প্রতি জনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের দাস রহিয়া যাইবে, এমন হইলে দীক্ষা নিষ্প্রয়োজন। তোমরা নিজেদেরই কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি চাহিবে আর ভুবন ভরিয়া শূদ্র

আর অপাংক্তেয়েরা অবজ্ঞার দুঃখপূর্ণ জীবন যাপন করিবে, এমন হইলে দীক্ষা লক্ষ্যহীন। তোমরা একটা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী রচনা করিয়া একটা বিরাট বিপুল দল সৃষ্টি করিবে আর নব নব কর্ম্মৈষণা নিয়া অন্য অন্য সঙ্ঘগুলি জনকল্যাণে অগ্রসর হইলে ঈর্ষ্যা, পরশ্রীকাতরতা, দুঃখ ও যন্ত্রণা অনুভব করিবে, সকল সম্প্রদায়কে নিজের এবং নিজেকে সকল সম্প্রদায়ের বলিয়া ভাবিতে পারিবে না,—এমন হইলে দীক্ষা অপ্রাসঙ্গিক।

এই জন্যই আমি তোমার ভ্রাতাটীকে জানাইয়াছি যে, নিজেরা সরল, সহজ, সুন্দর হও; অপরকে সরল, সহজ, সুন্দর হইতে সহায়তা কর; নিজেরা বড় হও, অন্যকে বড় হইবার সাহায্য কর;—ইহাই তোমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা— ও বাবা—, তোমাদের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। জীবনে তোমরা সুখী হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। দাম্পত্য জীবন একটা অত্যদ্ভুত সামঞ্জস্যের জীবন। এ জীবনে ত্যাগীর সংযম ও ভোগীর ইন্দ্রিয়-সেবা উভয় আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে। দুই দেশ

হইতে দুইটী জলধারা আসিয়া একটী নূতন মহানদে পরিণত হইতেছে। লতা ও বৃক্ষ এক হইয়া যখন অনন্ত আকাশের পানে ধায়; তখন সেই দৃশ্য হয় কত মহৎ। তোমরা লক্ষ্য রাখিও, তোমাদের যেন কোনও সময়েই ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে না হয়।

ভগবানের নিকটে নিয়ত প্রার্থনা করিবে যেন তাঁহার চরণে নিত্যারতি তোমাদের থাকে। অপর প্রার্থনা পূরণে তিনি কৃপণ হইলে হইতে পারেন, কারণ তিনি কেবলই দয়াময় নহেন, তিনি কর্ম্মফল-বিধাতাও বটেন, কিন্তু এই প্রার্থনায় তিনি কখনও বধির হন না। প্রাণ খুলিয়া ভগবানকে ডাকিয়া বলিবে,—ঠাকুর তোমার চরণে দাও ভক্তি, দাও প্রেম, দাও নিষ্কাম নিঃস্বার্থ সেবাবুদ্ধি।

চাহিলেই ইহা পাইবে। চাহিতে চাহিতে তাঁহাকে অধীর করিয়া তোল। তোমার ব্যাকুল ক্রন্দন তিনি শুনিতে ভালবাসেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, বহু বৎসর ধরিয়া কর্ম্মযোগ আর পুরুষকারের প্রশস্তি গাহিয়া হঠাৎ তোমাকে জুয়ার নেশায় ধরিল? সংবাদটা শুনিয়া যে মনে স্বস্তি পাইতেছি না। কৌশলে কিস্তিমাৎ করিবার ফন্দী ত'

কর্ম্মযোগ-সাধকের উপযুক্ত নহে! কেন তুমি জুয়ার আড্ডায় ঢুকিলে? কেন তুমি তাসের ফ্লাশ আর পাশার দানে মাতিলে? এই দুইটী জিনিষ যে তোমার অস্পৃশ্য!

পুরোহিতের বংশে জন্মিয়াছ। কোষ্ঠী-ঠিকুজী আর পঞ্জিকা তোমাদের আবাল্য সম্বল। কর্ম্মফল বলিতে সহজেই কর্ম্মের ফল না বুঝিয়া অদৃষ্ট বলিয়া ধরিয়া লও। তোমার পক্ষে জুয়ায় মাতিলে রক্ষা করিবার আর কে থাকিবে?

যে পুরুষকারকে বন্দনা করিয়া একদিন আমার স্নেহচ্ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলে, আজ পুনরায় সেই পুরুষকারেরই শরণাপন্ন হও। অদৃষ্টপরতা আর কোষ্ঠীর প্রতি ভক্তি আর তোমার উদ্ধারের পথ নহে। এখন তোমার পথ জাগ্রত পুরুষকার। তাহাই এক্ষণে অবলম্বন কর।

জুয়া খেলিতে গিয়া কাবুলীওয়ালার কাছে ধার করিয়াছ। এখন আবার জুয়ার দানে জিতিয়াই সেই ঋণ শোধ করিতে চাহ। কিন্তু জানিয়া রাখ, জুয়া কোনও সৎকর্ম্ম নহে যে ইহা সৎফল প্রসব করিবে। জুয়া অপকর্ম্ম। অতএব ইহা সকল সময়েই কুফল প্রসব করিবে। আশার ছলনায় ভুলিয়া বারংবার জুয়া-রূপিণী সেই কুহকিনীর শরণাপন্ন হইও না, যাহা তোমার উদরের অন্ন কাবুলীওয়ালার গ্রাসে নিয়াছে, যাহা তোমার পত্নীর পরিধেয় বস্ত্র শতচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, যাহা তোমার ক্ষুধাক্লিষ্ট সন্তানগুলির আয়ু করিতেছে প্রত্যহ অতি দ্রুত এবং অস্বাভাবিক ভাবে অপহরণ।

অবিলম্বে তুমি জুয়ার আড্ডা ছাড়। পণ কর যে, সদুপায়েই অর্দ্ধদগ্ধ উদরের জন্য যে কয় মুঠা অন্ন মিলে, তাহা হইতেই কিছু কিছু বাঁচাইয়া কাবুলীওয়ালার দেনা শোধ করিবে,—ভিক্ষার দ্বারাও নহে, জুয়ার দ্বারাও নহে। নিজের পুরুষকারে বিশ্বাস কর এবং অবিলম্বে কাজে লাগ। একটা সপ্তাহের দুঃখবরণে যেটুকু দেনা শোধ হইবে, তাহাই দেখিও তোমার মেরুদণ্ডে কত শক্তির সঞ্চার করে। আমার কথায় বিশ্বাস কর এবং পুরুষকার প্রয়োগ কর। ঈশ্বরে অপরিসীম প্রেম লইয়া পুনরায় পুরুষকারের সাধনায় ব্রতী হও। আর অদৃষ্টনির্ভরতা নয়।

আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৮শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাঠ করিয়া প্রাণ জুড়াইয়া গেল। পত্র কম লিখিলেও তোমার প্রাণের স্পন্দন নিয়ত এখানে পৌছে। প্রাণ যার সরস, তার পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের সকলের কাছে পৌছা সহজ। তুমি নিয়ত আমার নিকট পৌছিতেছ। আমি প্রতিনিয়ত হাজার মাইল দুর হইতে

তোমাকে কাছে পাইতেছি। নাই বা বাবা ঘন ঘন পত্র লিখিতে বসিলে! পত্র লিখিলেই ভক্তি প্রকাশ করা হয়, আর না লিখিলে হয় না, ইহা নহে। কাজের ভিতর দিয়া যেই ভক্তির প্রকাশ, তাহাই ত' আসল ভক্তি। সাহিত্য-রসে সঞ্জীবিত উচ্ছ্বসিত কাব্যধারাই ভক্তি-প্রকাশের শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে, ভক্তিরসে পরিপ্লুত শুদ্ধ সেবার ভিতর দিয়াই ভক্তির হয় নির্ভুল প্রমাণ।

এতকাল ছিলে মধ্যপ্রদেশে, এখন ত' তোমাদের সহরটা বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। আমাদের বলিবার সুযোগ হইল যে, আমাদেরই একটী নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী বোম্বাই রাজ্যেও সেবাসিদ্ধ করযুগ লইয়া নর-নারায়ণের সেবা করিতেছে। তোমার আরম্ভ ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু অমহান্ নহে। তুমি যে আরও দশটী প্রাণকে একত্র করিয়া কাজে হাত দিতে পারিয়াছ, ইহাই ত' তোমার ক্ষুদ্র প্রয়াসকে মহীয়ান করিয়াছে। সৎকাজ করা খুব ভাল কথা কিন্তু দশ জনকে লইয়া করিতে পারা আরও ভাল। ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে লইয়া যেদিন করিতে পারিবে, সেই দিন ইহা হইবে সকলের চেয়ে ভাল। সাধারণ ভাল কাজ এই ভাবে আস্তে আস্তে সকলের চেয়ে ভাল কাজে পরিণত হইতে পারে।

তোমার পত্রের কয়েকটা কথায় বড়ই হাসিলাম। অলৌকিক শক্তি দিয়া আমি কেন একযোগে সহস্র সহস্র লোকের রুচি, প্রকৃতি ও স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দেই না, কেন আমি সাধারণ মানুষের মত প্রাণান্ত শ্রম করিয়া একটী একটী করিয়া লোকের রুচি-প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছি। তোমার প্রস্তাবটীকে যদি ভাষান্তরে বলি, তাহা হইলে বলা চলে, কেন জগতের সবগুলি লোক লটারীর

টিকিটের জোরে একদিনে লক্ষপতি হইয়া যায় না। কেমন, তাহাই নহে কি? সাধুদের অলৌকিক শক্তির বলে কখনও কখনও কোনও কোনও লোকের অসাধারণ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাহা নহে। আমার যদি অলৌকিক শক্তি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে জগতের কিছু কিছু লোকের উপরে সেই শক্তির প্রভাব অবশ্যই কতকটা পড়িবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দৈবশক্তির বলে অসাধ্য-সাধন করিতে পারিলেও স্থল-বিশেষে তাহা দ্বারা মানুষের পুরুষকার এবং আত্মবিশ্বাসের হানি ঘটিবে বলিয়া নিশ্চয়ই সদাত্মা পুরুষেরা তেমন শক্তির ব্যাপক ব্যবহারে কুণ্ঠিত হইবেন। আমি যে সাধারণ মানুষ, ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ গৌরব। আমি অসাধারণ হইলে কি করিতাম, তাহা জানি না। আমি সাধারণ হইয়া সাধারণ রহিয়া সাধারণের মধ্যে কাজ করিতে চাহি, অসাধারণ হইয়া সাধারণের মধ্যে ঢুকিলে ত' পুরুষকারবিমুখ দৈববলমুগ্ধ বিমূঢ়বুদ্ধি কতকগুলি অপদার্থকে আলস্যে আর অদৃষ্টনির্ভরে দিব প্ররোচনা!

সাধারণ মানুষেরও অসাধারণ দৈববল আমি অস্বীকার করি না। এ দৈববল সাধনা হইতে আসে। এই দৈববলের সহায়তায় অন্য দশটী সাধারণ মানুষকে জীবনের পথ-গতিতে এক একটা বিশেষ মুহূর্ত্তে বিশেষ সহায়তা দেওয়া যায়। জগতে অনেক সাধারর মানুষ জীব-হিতৈষী পুরুষদের কাছ হইতে জীবনে দুই একবার এইরূপ সহায়তা পাইয়াছে। কিন্তু তার জন্য এরূপ প্রত্যাশা সঙ্গত হইবে না যে, তাঁহারা দুনিয়ার সকল লোককেই কেবল অলৌকিক শক্তির বলে ঠেলিয়া বড় করিতে থাকুন এবং সমস্ত জীবন ভরিয়াই ইহাই

তাঁহাদের হউক একমাত্র কাজ। অলৌকিক শক্তিতে নির্ভরশীলতা জাতির স্বাবলম্বন-স্পৃহার বিনষ্টি সাধন ক'রে।

মুদ্রণে বা উন্মীলনে তোমার চোখে আলোর খেলা দেখিতে পাও জানিয়া সুখী হইয়াছি। সাধন করিয়া যাও, আরও কত কি দেখিবে, কত কি শুনিবে, কত কি বুঝিবে। যখনই যাহা দেখ, শোন বা বোঝ, নিজের মধ্যেই রাখিও। এই সকল বিষয় প্রকাশ করিতে নাই। অরূপের মধ্যে রহিয়াছে পরম রূপ, রূপের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বিস্ময়কর চির-অরূপ। দেখিলে দেখা হয় না, জানিলে জানা হয় না, না দেখিয়াও দেখা যায়, না জানিয়াও জানা হয়। এই যে বিচিত্র উপলব্ধি-লহরী, তাহা পবন-হিল্লোলের মতই অবারিত, তরঙ্গ-মালিকার মতই নিরন্তর, প্রস্রবণ-ধারার মতই অবিচ্ছেদ ও অভঙ্গ। সাধন করিয়া করিয়া ইহা প্রত্যক্ষ কর। যোগজ অনুভূতি কোনও যুক্তি বা তর্কের অধীন নহে, ইহা ন্যায়শাস্ত্রের পঞ্চাঙ্গ বিচারায়ত্ত সিদ্ধান্ত মাত্র নহে। সাধন কর আর প্রত্যক্ষ কর। যাহা যখন প্রত্যক্ষ করিলে, তাহা অতীতের ক্ষুদ্রতর উপলব্ধির ভাষ্য এবং ভাবী বৃহত্তর উপলব্ধি-সম্ভাবনার সহিত সুসমঞ্জস। দুয়ার তোমার খুলিয়া যাইতেছে, ভাটার জল নামার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করিয়া উপলব্ধি-নদী-তট প্রশস্ততর হইতেছে। আশা ও উৎসাহে বুক বাঁধ বাবা, বুক বাঁধ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরি-ওঁ কলিকাতা
২৮শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা— ও মা—, তোমাদের ভক্তিমাখা পত্র পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। সংসারে ভক্তিই শান্তির উৎস। যে ভক্তিমান, জগতে তার মত সুখী আর কেহ নাই। যত পার, প্রাণের ভক্তিকে বর্দ্ধিত কর। ভক্তি কর জগতের সকল সদ্‌গুণান্বিত পুরুষ-নারীকে, ভক্তি কর যুগপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মরক্ষক লোকপালক সকল মহাপুরুষকে, ভক্তি কর জগতের সকল ঈশ্বরভক্ত সাধক-সাধিকাকে, ভক্তি কর ভগবানের প্রত্যেকটী সেবককে। ভক্তিরত্ন আঁচলে বাঁধিয়া সহাসমুদ্রেও যদি ডুব দাও, কোনও হাঙ্গর-কুমীর তোমাকে স্পর্শমাত্রও করিতে সাহসী হইবে না।

জীবনে ভক্তি যে কত বড় এক মহাসম্পদ, তাহা জানে না বলিয়াই সর্ব্বসাধারণ অভক্তের সঙ্গ করে, কুতার্কিকের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে, অবিশ্বাসীদের সহিত মেলামেশা করে। ভক্তজনের সংসর্গে অন্তরে ভক্তিভাব জাগরিত হইয়া অহংভাবকে প্রশমিত করে এবং প্রাণমন করে কোমল, মধুর ও শীতল। এমন প্রাণের স্পর্শে যাহারা আসে, তাহাদেরও সকল অশান্তি দূর হইয়া যায়।

তোমরা তোমাদের ওখানে আমাকে চাহিতেছ। সকলেই কি চাহিতেছ? হয়ত কেহ কেহ চাহিতেছ, কেহ কেহ ভয় পাইতেছ।

সকলে মিলিয়া না চাহিলে আমারই বা যাইবার আগ্রহ প্রবল হইবে কেন? না চাহিলেও আমি যাই, বাধা দিলেও আমি যাই, কিন্তু তোমাদের ওখানে যে আমি তোমাদের সকলের প্রাণভরা আগ্রহের মধ্য দিয়া যাইতে চাহিতেছি বাবা! তাই তোমাদের চাওয়াটা আর একটু পাকা হওয়া প্রয়োজন। লাঠি মারিবার ভয় দেখাইয়াছে, দাড়ি ছিঁড়িবে বলিয়া শাসাইয়াছে, এমন জায়গায়ও ত' গিয়াছি। গুপ্তঘাতক অস্ত্র হস্তে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে, এমন কি বারো ইঞ্চি লম্বা শাণিত ছুরিকা নিয়া বক্তৃতা-মঞ্চে আমার ঠিক কাছটায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি ত' কর্ত্তব্য-পরিহার করি নাই। সভামঞ্চে বিস্ফোরক সহ আততায়ী ধরা পড়িয়াছে, তার পরেও ত' ভ্রমণ বন্ধ করি নাই! ঝোপের আড়ালে আততায়ীরা প্রতীক্ষা করিতেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে এমন সংবাদ পাইয়াও ত' কর্ম্মতালিকার পরিবর্ত্তন করি নাই। এমন ঘটনা আমার জীবনে দুই দশটী নহে, ত্রিশ চল্লিশ বার ঘটিয়াছে। সুতরাং কর্ম্ম-প্রয়োজনে আমার কোনও স্থানেই ভ্রমণ-তালিকা করিতে আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু তোমাদের ওখানে সাধিয়া যাইতে চাহিয়াছিলাম, তোমাদের ওখানকার লোকেরাই ভ্রমণ বাতিল করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে ত' আমি আর তোমাদের সর্ব্বজনীন আগ্রহ না দেখিলে সেখানে যাইতে পারি না।

মনে যেন করিলাম, সকলেই আমাকে চাহিতেছ। কিন্তু কেন চাহিতেছ, তাহাও ত' আমাকে জানিতে হইবে। বক্তৃতা দিয়া করতালি কুড়াইবার অভিলাষ ত' আমার নাই। আর তোমরাও কি বক্তৃতা

শুনিবার পরে শোনার অতিরিক্ত আর কিছু করিবে? কথা যদি এক কাণ দিয়া প্রবেশ করিয়া আর এক কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে আমার এই বাগ্মিতা-প্রকাশের পরিশ্রমটা কি শুধু বিড়ম্বনাতেই পর্য্যবসিত হইবে না? তোমরা আমার ভাষণ শুনিবার আগে ইহা মনে ও প্রাণে ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য পালন সুরু করিবে কি? ব্রহ্মচর্য্য এক মহৎ বল। সাত, আট, দশ দিনের জন্যও যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, সে ব্রহ্মচর্য্যেরই শক্তিতে এক অসামান্য একাগ্রতা সঞ্চয় ক'রে। এই একাগ্রতা তাহাকে শ্রুত বিষয়ের অর্থাবধারণে এবং সেই অর্থকে ধারণ করিয়া রাখিতে অসাধারণ সহায়তা দেয়। এই সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তোমরা প্রতি জনে আমার এই পত্র পাওয়া মাত্রই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন আরম্ভ করিবে কি? যতদিন আমি তোমাদের ওখানে গিয়া আমার বাণী তোমাদের না শুনাইব, ততদিন তোমরা কামেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করিবে না, কাম-বিষয়ে চিন্তা করিবে না, এই সঙ্কল্প করিবে কি? আমি যাইয়া কতকগুলি হিতোপদেশ প্রদান করিলেই ত' আর হইয়া যাইবে না। এই হিতোপদেশ পালন করিবার জন্য যোগ্যতা চাই, আর সেই যোগ্যতা আসে ব্রহ্মচর্য্য হইতে। তোমরা হয়ত জান না যে, উপদেশ যাহাতে প্রকৃত উৎস হইতে উৎসারিত হইতে পারে, একমাত্র সেই উদ্দেশ্য নিয়া প্রকৃত উপদেষ্টাকেও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয়।

আরও জানা দরকার,—তোমরা কি আমার উপদেশ পালন করিবে? আমার হিতবচন যদি মধুর বা হৃদয়গ্রাহী হয়, তাহা হইলে

তোমরা তাহার প্রশংসা করিয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেই আমি খুশী হইয়া যাইতে পারি না। তোমাদের মধ্যে আমি আমাকেই দেখিতে পাইতেছি। তাই তোমাদের প্রতি আমার অসীম মমত্ব। আমি ত' তোমাদের মধ্যে আমার উপদেশগুলিকে মূর্ত্তিমন্ত দেখিতে চাহি। আবার, আমার উপদেশগুলি যদি হৃদয়গ্রাহী নাও হয়, অথচ তোমাদের পক্ষে হিতকর হয়, তাহা হইলে সেই অপ্রিয় উপদেশ পালন করিতে চেষ্টা তোমরা করিবে কি?

ভিন্ন কোনও স্বার্থের লোভে যাহারা বক্তৃতা দিয়া বেড়ায়, তাহাদের আর প্রয়োজন পড়ে না ইহা দেখিবার যে, তাহাদের হিতবাক্যানুযায়ী কাজ হইল কিনা। আমার পক্ষে ত' বাবা সে কথা চলিবে না। আমি জীবনে সুদীর্ঘকাল মৌন সাধনে কাটাইয়াছি আবার সহস্র সহস্র মঞ্চ হইতে বক্তৃতাও দিয়াছি। কিন্তু ইহার মধ্যে ভিন্ন কোনও স্বার্থের লেশও ত' কখনও ছিল না। উপদেশ দিবার পরে তাহা অপালিত হইলে আমি তাহা সহ্য করিব কি করিয়া? অবশ্য, অবহেলিত হইবে জানিয়াও অতীতে হাজার হাজার হিতভাষণ বর্ষণ করিয়াছি কিন্তু তাহা নিতান্তই অনিমন্ত্রিত হইয়া। এখন যে তোমরা নিমন্ত্রণ করিতেছ। এই জন্যই ত' আমার জানিবার প্রয়োজন হইতেছে যে, তোমরা ডাকিয়া নিয়া কথা কহাইয়া আবার তাহা সঙ্গে সঙ্গে অপালন করিবে না ত'! আমি ত' প্রথমেই তোমাদের কহিব,—জীবিকা হইতে অসত্য, পাপ ও প্রবঞ্চনাকে দূর কর। আমি ত' তোমাদের তারপরেই কহিব, অন্তরের শুদ্ধতা সম্পাদনে কতক পথ

অগ্রসর হইবার আগ পর্য্যন্ত প্রতি জনে সঙ্কল্পপূর্ব্বক সন্তান-জনন বন্ধ রাখ। আমি ত' তোমাদের কহিব,—ভগবৎ-সাধনাকে জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া সেই কর্ত্তব্যকে সুচারু রূপে সম্পাদনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে গৌণ কর্ম্মরূপে অন্যান্য যাবতীয় কর্ত্তব্য পালন কর। আমি ত' তোমাদের কহিব,—জাতি, বর্ণ ও ঐশ্বর্য্যের দরুণ মানুষে মানুষে যে বৈষম্যবোধ ও অসম্প্রীতি জন্মিয়াছে, প্রতিজনে নিজেকে জগতের প্রতিটী প্রাণীর ন্যায় একই ঈশ্বরের সন্তান জানিয়া সেই বৈষম্যবোধের স্থলে সমত্ব ও অসম্প্রীতির স্থলে মমত্ব স্থাপন কর। লাগিবে এসব কথা ভাল?

তোমাদের ওখানে বহু দীক্ষার্থী প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, একথাও আমি শুনিয়াছি। যাঁহারা আমার আপন জন, তাঁহারা আমার জন্য অনন্তকাল প্রতীক্ষা করিবেন, ইহা ধ্রুব। সুতরাং আমার এই পীড়িত শরীরে এখনই ছুটিয়া যাইবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। দীক্ষা নেওয়া ভাল কথা কিন্তু এই কার্য্যটায় তাড়াহুড়া এবং হুজুগ যত বর্জ্জন করা যায়, ততই ভাল। যে আসে তাহাকেই দীক্ষা দেই, বিচার করি না, ইহা আমার উদারতাও হইতে পারে, দুর্ব্বলতাও হইতে পারে। কিন্তু দলে দলে লোকেরা আসিয়া আমার নিকটেই দীক্ষাপ্রার্থী হউক এই লোভ আমার নাই। লোকহিতকামনায় আরও গুরুদেব যাঁহারা অনুগত ব্যক্তিদের দীক্ষা দিতেছেন, তাঁহাদের কাছেই যাউক না ইহারা। দীক্ষা যেখানেই নিক, সাধন করাটাই ত' বড় কথা। সাধন করিলে আপনিই সাম্প্রদায়িক হীনতা কমিয়া যায় এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ে

নিজ ইষ্টের মহিমা উপলব্ধিতে আসে। যাহারই যে শিষ্য হউক, কেবল শিষ্য হইলেই হইল না, সাধকও হওয়া চাহি। অমুকের শিষ্য, এই পরিচয়টী অপেক্ষা ভগবানের নামের সাধক, এই পরিচয়টী অনেক বড়, অনেক মহান্। তোমাদের ওখানে বহু দীক্ষার্থী ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দিন গুণিতেছেন, ইহা কোনও মন্দ কথা নহে। কিন্তু দুই দিন পরে যাঁহারা দীক্ষা নিয়া আমার শিষ্য হইবেন বলিয়া অভিলাষ করিতেছেন, তাঁহারা শিষ্য হইবার আগে আমার চিন্তাপ্রণালী ও জীবনাদর্শের সঙ্গে একটু আধটু পরিচয় স্থাপনের জন্য চেষ্টিত হইতেছেন কি? তোমরাও কি তাঁহাদের নিকটে আমার শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি পরিবেশন করিয়া যাইবার কোনও ধারাবাহিক চেষ্টা করিতেছ? আমার শিষ্য হইবার পরে নিজ ঠাকুরঘরে হাজার খানিক দেবতার মূর্ত্তি সাজাইয়া একটী যাদুঘর সৃষ্টি করিলে কেহ কি তাঁহাকে আমার শিষ্য বলিয়া মানিবে? আমি ত' একের পূজারী।

এইরূপ অনেক বিষয় তোমাদের বিবেচনা করিবার রহিয়াছে। আমার ওখানে যাওয়া কোনও অসাধারণ ঘটনা নহে। আমি যে-কোনও দিন তোমাদের ওখানে গিয়া হাজির হইতে পারি। কিন্তু আমার যাওয়ার ফলে তোমাদের কাহারও জীবনে যদি অসাধারণ ঘটনা কিছু না ঘটিল, তবে এ যাওয়ায় লাভ কি? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরি-ওঁ কলিকাতা
২৯শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার পত্র পাইয়া ব্যথিত হইলাম। ষোল বৎসর যাবৎ বিবাহিত জীবন যাপন করিতেছ অথচ প্রতিদিন তোমাদের দাম্পত্য কলহ চলিতেছে, এই সংবাদ ত' সুখের নয়। তিন দিন দুটো লোক একত্র বাস করিলে পরস্পরের সঙ্গে কত ভালবাসা হয়, আর ষোল বৎসর ধরিয়া তোমরা একত্র বাস করিতেছ, তবু কি তোমাদের মধ্যে একটু ভালবাসা হইল না?

ভালবাসা কেমন জিনিষ জানো? যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার গুণগুলিকে বেশী করিয়া দেখে, তাহার দোষ ক্ষমা করে, তাহার অত্যাচার উৎপীড়ন প্রেমেরই অন্যতর প্রকাশ ভাবিয়া হাসিমুখে সহ্য করিয়া যায়। প্রেমিক স্বামী স্ত্রীর অত্যাচার সহিয়া যায়, প্রেমিকা পত্নী স্বামীর অবিচারে অবিচল থাকে। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের এই ক্ষমাশীল সহিষ্ণুতা জন্মে মা ভালবাসার গুণে।

ষোল বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করিলে, একত্র বাস করিলে, জীবনের কত সুখ-দুঃখ একত্র ভোগ করিলে, তবু কেহ কাহাকেও ভালবাসিতে পারিলে না? এই একটা অভিযোগই যে তোমাদের বিরুদ্ধে কত গুরুতর, তাহা ভাবিয়া দেখিও।

কেন তোমরা একে অন্যকে ভালবাসিতে পারিলে না? নিজের

স্বার্থটাকে কি বড় করিয়া দেখ মা? স্বামীর স্বার্থের কাছে কি নিজেরটাকে বলি দিতে পার না?

হয়ত যোলটী বছরের মধ্যে এই সামান্য কথাটুকুও কেহ তোমাকে বলে নাই। তাহারই জন্য এমন দুঃখ ভুগিতেছ। আজ হইতে জীবনের গতি-পরিবর্ত্তন করিয়া ফেল। সঙ্কল্প কর যে, মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিয়া যাইবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর,—হে প্রভো, আমাকে ভালবাসিতে শিখাও।

তোমার ভিতরে ভগবান রহিয়াছেন, তোমার স্বামীর ভিতরেও। পরস্পর পরস্পরের রক্তমাংসটাকেই কেবল দেখিয়া বেড়াইতেছ আর তার ফলে অশেষ দুঃখ পাইতেছ। জড় দৃষ্টি তোমরা পরিহার কর, পরস্পর পরস্পরের ভিতরের চৈতন্যময় সত্তাকে দর্শন কর। দেখিও, সব দুঃখ দূর হইয়া যাইবে। আমি ত' তোমাদের দুঃখ দূর করিতেই চাহি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২৯শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ তোমরা একটী মণ্ডলী গঠন করিয়াছ। কোনও প্রকারে বর্ষ অতিক্রম করিয়াছ। ইহারই মধ্যে ঝগড়া-কোন্দল

লাগিয়া গেল দেখিয়া যে অবাক হইয়া যাইতেছি। মণ্ডলী গঠনের তোমাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল নিয়মিত সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা করা এবং তাহার মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি প্রেমানুশীলন।

কিন্তু তাহা না হইয়া একটী বৎসরের মধ্যেই তোমাদের অখণ্ডমণ্ডলী খণ্ড খণ্ড হইতে চলিয়াছে, মিলনের মঞ্চ রণক্ষেত্রের রূপ ধরিয়াছে। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ মণ্ডলীর সম্পাদককে রাস্তাঘাটে ধরিয়া চড়-চাপড় মারা সুরু করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, এই জন্যই কি তোমরা ওঙ্কার-মহামন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলে, যেই মহামন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রের মিলন-ভূমি?

আমি মণ্ডলীর কার্য্য-বিবরণী ও হিসাব-পত্রাদির নকল পাইয়াছি। মণ্ডলীর সাতাশ জন সভ্য ও সভ্যার স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিও পাঠ করিয়াছি। আমার ধারণা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সম্পাদক সাধ্যমত সততার সহিতই কাজ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে মিছামিছি চৌর্য্যের অভিযোগ করা হইয়াছে। আর, সেই অভিযোগ মণ্ডলীর অধিবেশনে না করিয়া, সম্পাদককে হিসাব-পত্র-সাহায্যে অভিযোগ খণ্ডনের সুযোগ না দিয়া রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে অপপ্রচার করিয়া বেড়ান কোনও সভ্যতা-সম্মত কার্য্য নহে। বিরুদ্ধপ্রচারকারী তোমাদের ভ্রাতাটীর অভিযোগ করিবার পদ্ধতি শিষ্টাচারবিরোধী এবং অমার্জ্জিত। তোমরা তাহাকে হিতবচনে বুঝ-প্রবোধ দিয়া সত্য, সরলতা এবং প্রেমের পথে টানিয়া আন। তাহার ভিতরেও সদ্গুণ ও অশেষ যোগ্যতা আছে। সৎপথে সে তাহার প্রয়োগ করুক।

তোমাদের সকলের ভিতরেই কতকগুলি বিষয়ে জাগ্রত ভদ্রতা-

জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী বিষয় হইল এই যে, কেহ কাহারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করিতে চাহিলে, তাহা মণ্ডলীর অধিবেশনেই করিতে হইবে এবং চোপার জোরে মীমাংসা না করিয়া প্রেমের মধ্য দিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইবে। অভিযোগকারী মাত্রেরই মনে রাখা উচিত যে, অপরের সম্মান রাখিয়া চলিবার চেষ্টার দ্বারা নিজের সম্মান বর্দ্ধিত হয়। নিজের সম্মান খোয়াইয়া যে অপরের সম্মান কমাইতে চাহে, সে ত' নিতান্ত বন্য প্রাণী বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য হইবে!

মণ্ডলীর সভাধিবেশন ও মণ্ডলীর সমবেত উপাসনা, এই দুইটী কাজ অভিন্ন নহে। অতএব একই দিনে এই দুইটী কাজ না করাই ভাল। সভাধিবেশনের কালে অনেক অবান্তর বা উত্তেজক বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব নহে। যদিও প্রেমের দ্বারা মীমাংসা করিবে, তবু উপাসনার আবহাওয়া ইহাতে নষ্ট হয়। সুতরাং উপাসনার দিন উপাসনাই করিবে, সভা নয়, সমিতি নয়, তর্ক-বিতর্ক নয়, গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ নয়।

সভা করিতেই আস আর উপাসনা করিতেই আস, মণ্ডলীতে বসিয়া আদর্শ-বিরোধী আলোচনা চলিবে না। ধূমপান, থুথু ফেলা, তাস খেলা, ইত্যাদি কার্য্য এই স্থানটীতে চলিবে না। ভাইবোনদের সম্মানে আঘাত করা কোনও স্থানেই চলিবে না, এস্থানে ত' কিছুতেই না। মণ্ডলীর গৃহে বসিয়াই যদি তোমরা সনাতনী গোঁড়া ব্রাহ্মণদের একাংশের মত ওঙ্কারবিগ্রহের নিন্দা সুরু কর, তাহা হইলে সেখানে তোমাদের স্থান হইতে পারে না। মূল সত্যে যাহার বিশ্বাস নাই এবং

বিগ্রহকে যে সম্মান করে না, তাহার মণ্ডলী-গৃহে প্রবেশ করিবার কোন্ প্রয়োজন আছে? ওঙ্কারবিগ্রহ যাঁহার নামের প্রতীক, তাঁহাকে ভাল না বাসিবারই এই পরিণাম। তোমরা ভগবানে প্রেমভক্তি লাভের জন্য আগ্রহী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩০শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা প্রত্যেকেই সংসারের সহস্র পীড়নে জর্জ্জরিত। তাই তোমরা সৎকর্ম্মে সহায়তা করিবার জন্য সময় দিতে পার না। এই একটী কথা আমি হাজার জনের মুখে শুনিতেছি। কিন্তু ইচ্ছা করিলে বাবা সময় হয়। তোমাদের ইচ্ছা নাই, তাই উপায় হয় না, সময় হয় না। আর ভগবানে বিশ্বাস থাকিলেও সময় হয়। বুকে হাত দিয়া দেখ, সেখানে ভগবদ্বিশ্বাস কিছু আছে কিনা। ভগবদ্বিশ্বাসীর পক্ষে হাজার বাধার মধ্য দিয়া সৎকর্ম্মে সহযোগ সম্ভব। বিশ্বাসী হৃদয় হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও ফাঁক করিয়া লয়।

একা কাজ করিয়া জগতে কে কতটুকু করিতে পারে? এজন্যই দশের হাত লাগা প্রয়োজন। কিন্তু সবগুলি হাত এক সঙ্গে লাগা চাই। আগে-পরে হইলে চলিবে না। এই একটী জরুরী কথাও

তোমরা মাঝে মাঝে মারাত্মক ভাবে ভুলিয়া যাইতেছ।

সমাজ-কল্যাণ-মূলক উদ্দেশ্যে যে কাজ, তাহাতে লজ্জা-ভয় থাকিলে চলে না। তোমাদের ভিতরে লজ্জা ও ভয় বড় বেশী। ভয়কে জয় না করিলে অনাগতকে করামলকবৎ আয়ত্ত করা যায় না। লজ্জাকে জয় না করিলে বর্ত্তমানকে পূর্ণরূপে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

যত কাজ, সবই যে ভগবানের কাজ, এই কথাও মনে রাখিতে হইবে। তবে ত' আসিবে কর্ম্মের মধ্যে বাধা-বন্ধ-হীন প্রেম। প্রেম না আসিলে কোনও সাধনায় সিদ্ধি জন্মে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩০শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমার নব-উপনীত পুত্র প্রকৃত ব্রাহ্মণ হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

সদাচার দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছে, সত্যবাদিতা ও সংযম লোপ পাইয়াছে, শরীর-মনের পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি কমিয়াছে। এমন দেশে ব্রাহ্মণ মিলিবে কোথায়? ব্রাহ্মণের বড়ই অভাব।

আমি চাহি, সমগ্র দেশ ব্রাহ্মণে ভরিয়া যাউক। কদাচার লোপ

পাউক। সত্য, সংযম ও সাধনা আবার ঘরে ঘরে ফিরিয়া আসুক। যজ্ঞোপবীত ধারণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পুষ্টি-বিধানে সেই হিসাবে সহায়তা করে, সৈনিকের ইউনিফর্ম্ম যেমন সৈনিকোচিত মনোভাব সংরক্ষণে সহায়তা দেয়। কিন্তু যজ্ঞোপবীতও ব্রাহ্মণত্ব দেয় না, ইউনিফরমও সৈনিকত্ব দেয় না। সৈনিক হইতে হইলে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, ব্রাহ্মণ হইতে হইলে সংযম ও সদাচারের মধ্য দিয়া সাধন করিতে হয়। অসংযমী, অসদাচারী, অসাধক কোনও কালেই ব্রাহ্মণ হয় না। সাধন করিতে হইলেই স্কুলের পড়া, অফিসের চাকুরী, বাজারের দোকানদারী ছাড়িয়া দিতে হইবে, তাহা নহে। যুগটা যেমন ঘোর কলি, জীবকে সরল সহজ উপায়ে সাধন করিবার কৌশলও তেমন দেওয়া হইয়াছে। সাধনের বাহ্য আড়ম্বরগুলি জীবন-সংগ্রামের কঠোরতায় ক্রমশঃ কমিয়া কমিয়া সূক্ষ্মতম ও সুন্দরতম রূপ ধারণ করিয়াছে। যে-কোনও-জীবিকার্জ্জনকারী কলিযুগে সাধন করিয়া ভগবানের দিকে আগাইতে পারে, ভগবদ্দর্শন করিতে পারে।

সংযমী হইতে হইলেই বনে যাইতে হইবে, তাহাও নহে।

সদাচারী হইতে হইলেই শুচিবায়ুগ্রস্ত হইতে হইবে, এমনও নহে।

তোমার পুত্র সাধনশীল হউক, তবেই সে ক্রমে ক্রমে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরি-ওঁ কলিকাতা

৩০শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পরিচিত ব্যক্তিদের সহিত প্রকৃত প্রণয় স্থাপনের উপায় হইল, তাহাদের সহিত শ্রীভগবানের মঙ্গলময় প্রেমের প্রসঙ্গ করা। তাঁর করুণায় আচ্ছাদিত নিখিল নিলয়ে তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখিবার প্রয়াস করা। যে যেখান হইতে যে ভাবেই আসিয়া তোমার সন্নিহিত হইয়া থাকুক, তাহাকেই এই মধুময় প্রয়াসে যুক্ত করা। একজনকেও অভক্ত, অজ্ঞান, অপ্রেমী থাকিতে দিব না,—এই জিদ নিয়া প্রত্যেকের চিত্ত-সংস্কারের অপ্রতিকূল ভাবে তাহাকে আস্তে আস্তে সৎসঙ্গ দান করা। বিশ্বপিতার সন্তান বলিয়া নিজেকে যদি জানিতেছ, তাঁহার অপর সন্তান-দিগকেও ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট কর। সকলে যখন ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইবে, তখন তোমাদের প্রতি জনের মধ্যে যে প্রেম হইবে, তাহা হইবে শাশ্বত এবং অকৃত্রিম।

ভগবানের নাম করিয়া পাঁচ জনে মিলিত হয়, আনন্দ করে, আনন্দ দেয়, তারপরে হঠাৎ একদিন একজন হয়ত কর্ত্তৃত্বলোভে অপরকে আঘাত সুরু করে। ইহাও কখনও কখনও ঘটিতেছে। ইহার প্রকৃত কারণ কিন্তু লোক দেখাইবার জন্য ভগবানের নাম করা, ভগবানকে ভালবাসিবার জন্য নয়। তোমরা তোমাদের ভক্তি-প্রেম-

গোষ্ঠিতে আত্মকর্ত্তৃত্বের আর অহমিকার জন্য কোনও প্রশ্রয় রাখিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরি-ওঁ কলিকাতা

৩১শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পুত্রকে বিবাহ দিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পুত্র ও পুত্রবধূর জীবন সুখময়, শান্তিময়, আনন্দময়, অনাময়, সেবাময় ও সুদীর্ঘ হউক।

পুত্রের নিকটে লোকে বংশরক্ষা কামনা করে। তুমিও তাহাই করিতেছ। প্রধানতঃ এজন্যই পুত্রকে বিবাহ করাইয়াছ। এখন তোমার কর্ত্তব্য হইবে পুত্রকে সুসন্তানের পিতা হইতে হইলে যে যে যোগ্যতা সঞ্চয় করিতে হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া। বিবাহের আগেই এই উপদেশ তাহার পাওয়া সঙ্গত ছিল। কিন্তু আগে যদি না পাইয়া থাকে, তাহা হইলে এখন আর দেরী হওয়া উচিত নহে।

বিবাহের পরে কিছু দিন নবদম্পতীর একটা মোহময় আবেশের মধ্যে দিন কাটে। ইহা স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক বলিয়াই ইহা অনিন্দনীয়। কিন্তু এই মোহময় আবেশ তাহাদিগকে যাহাতে বিগতমোহ

অনিন্দ্যসুন্দর সামঞ্জস্যের জীবনে টানিয়া নেয়, তোমার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ পিতার তাহা দেখিতে হইবে। প্রাচীন ঋষিরা পুত্রকে যৌন বিষয়ে জ্ঞানদান করা পাপ মনে করিতেন না।

ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই বিরাজিত। কিন্তু তাঁহাকে মনে রাখে কে? পুরুষের শিশ্নে, নারীর যোনিতে, মনের তরঙ্গে, বাসনার হিল্লোলে, সর্ব্বত্রই এক ব্রহ্ম বিরাজিত। নরনারী ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে, বাসনার উদ্দাম তরঙ্গ-হিল্লোলে অজ্ঞানের মত হাসিয়া নাচিয়া উড়িয়া ভাসিয়া প্রজাপতির মত বেড়ায় কিন্তু ব্রহ্মকে দেখিতে চেষ্টা ক'রে কোথায়?

পুত্রের জীবনে সেই চেষ্টাকে জাগরিত করিয়া দেওয়াই পিতার প্রধান কর্ত্তব্য,—অবশ্য যদি পুত্র হয় গৃহী। যাহার পুত্র সন্ন্যাসী হইয়া একান্তে তপস্যা করিবে, তাহার সম্পর্কে এই বিষয়ে দুশ্চিন্তা করিবার কিছু নাই। নারী-সংশ্রব-বিরহিত তাহার জীবন নিজ ব্রহ্মধারণার ভঙ্গিমা নিজেই চিনিয়া নিবে।

তুমি তোমার ওখানে পার্ব্বত্য অধিবাসীদের নিয়া মাঝে মাঝে মেলা বসাইতে চাহিতেছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। সাধারণতঃ মেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠান কতকটা বহিরঙ্গ প্রকৃতির হইয়া থাকে। মনকে অন্তর্মুখ করিবার দিকে ইহাদের উপযোগিতা অল্প। কিন্তু যে-কোনও নূতন একটা ভাবকে জন-সমাজের মধ্যে প্রচারের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে ইহাদের উপযোগিতা অসাধারণ। ডিব্রুগড়ে আমরা যে চিত্র-প্রদর্শনীটী করিয়াছিলাম, তাহা পর পর আসামের আটটী সহরে উদ্দীপনা-সৃষ্টি করিয়া আগরতলা হইতে কলিকাতা আসিয়াছে। ভাব-প্রচারের দিক্ দিয়া এই জিনিষের যথেষ্ট উপযোগিতা

আছে। কিন্তু ভাবকে প্রগাঢ় করিবার উপায় ত' ইহা নহে। ভাবকে প্রগাঢ় করে 'সাধন'।

'সাধন' বলিতে ব্রহ্মচর্য্যপালন এবং তৎসহ ধ্যান-বিশেষের অনুশীলন বুঝিতে হইবে। যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব, সে যদি ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা হইতে মাত্র ততটুকুই বিরত থাকে, তবে তাহার পক্ষে উহাই ব্রহ্মচর্য্য সংজ্ঞা পাইবে। বহুনারীগামী পুরুষ যদি একটী মাত্র নারীতে তাহার যৌন প্রয়োজনকে সীমাবদ্ধ করে, তবে ইহাই তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য হইবে। নিত্যরতিবিলাসী পুরুষ যদি তাহার যৌনাভিলাষকে সপ্তাহে একটী দিনে আনিয়া সীমাবদ্ধ করে, তবে ইহাই তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য হইবে। এই ভাবে, যাহার ইন্দ্রিয়-সুখ-চর্চ্চা যতটা আছে, সে যদি তাহা কিছুটা করিয়া সঙ্কুচিত করিয়াও ভগবদ্-ধ্যানে লাগে তবে তাহাই তাহার পক্ষে 'সাধন' করা বলিতে হইবে। সকলেই জিতেন্দ্রিয় শুকদেব হইতে পারে না কিম্বা বিল্বমঙ্গলের দলও চিরকাল অসংযত থাকে না।

নিরঙ্কুশ-নারী-সংস্রবীকে এক-নারী-নিষ্ঠ করাও একটা বড় কাজ। ইহাকেও তোমরা ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার বলিয়াই মনে করিও। সমতলবাসী বা পাহাড়ী, সকলের ভিতরেই এই কাজটুকু তোমাদের করিবার আছে। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের সহায়িকা রূপে মেলা প্রভৃতি করিতে চাহ ত' কর। ইহা আমি অনুমোদন করিতেছি।

মেলা জমাইবার কালে মনে রাখিও যে, এই সব উপলক্ষে যেই সকল চপল পাপ জনসমাজে প্রসারিত হইয়া থাকে, তাহার দুয়ার গোড়াতেই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। পুপুন্‌কীতে আমি কয়েকবার প্রদর্শনী তথা মেলা জমাইয়াছি। তাহাতে আমাকে জুয়াখেলা প্রভৃতি

পাপ কঠোর হস্তে দমন করিতে হইয়াছে। দেখিয়াছি, শান্তিরক্ষক পুলিশ পর্য্যন্ত এই সকল পাপের প্রতি উদ্যতদণ্ড নহে। জুয়াড়ীকে মেলার স্থান হইতে তুলিয়া দিলে কোনও কোনও পুলিশের লোক বিরক্ত হইয়াছে। ইহার কারণ আমার বুঝিবার সাধ্য নাই। কিন্তু তোমরা এই সকল ব্যাপারে কঠোর হইও। ক্ষুদ্র পাপের সহিত আপোষ করিলে বৃহৎ পাপ জাকাইয়া বসিবে।

মেলা যখন যেখানে হয়, দেখিয়াছি, কোনও একটা পর্ব্ব-দিবসেই হয়। অতীতে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট তিথি-নক্ষত্রে কোনও পুণ্যকার্য্য হইয়াছিল। তাই এক একটা তিথি জনসমাজে বড় শ্রদ্ধার দিন। সেই উপলক্ষেই মেলা বসে। এমতাবস্থায় মেলার মধ্যে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও পাপকেই আসন পাতিতে দেওয়া চলিবে না। একথা স্মরণে রাখিও।

বন-পর্ব্বত-বাসী অনগ্রসর জাতিগুলির নৃত্য, গীত এবং অনেক সময়ে অত্যাধিক পানাসক্ত হওয়া ব্যতীত কোনও আনন্দানুষ্ঠান নাই বলিলেই চলে। তাহাদিগকে এক একটা কেন্দ্রে একত্র করিয়া নানা প্রকার নির্দ্দোষ আনন্দ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ বিষয়ে চিন্তা করিতে বাধ্য করা চমৎকার সমাজসেবা। স্থানীয় হৃদয়বান সমাজ-কর্ম্মীদের সহিত মিলিত হইয়া তোমরা স্থির করিয়া লও যে, তোমাদের অতীতের অনুষ্ঠানগুলি অপেক্ষাও অধিকতর শিক্ষাপ্রদ ও চিত্ত প্রমোদক কার্য্য-তালিকা কি হইতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরি-ওঁ কলিকাতা

৩১শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। সহায়-সম্বলহীনা নারী তুমি যক্ষ্মার মত রোগে ভুগিয়া পূর্ণ সুস্থ হইয়া। আশ্রয়-শিবিরে ফিরিয়াছ, ইহার মত আনন্দের সংবাদ আর কি আছে? প্রায় পুনর্জ্জন্ম পাইয়াছ। এমত অবস্থায় সঙ্কল্প কর, বাকী জীবনটুকু তুমি যতটুকু পার, ভগবানের কাজেই লাগাইবে। কেহ দরিদ্র হইলেই ভগবানের কাজ করিতে পারিবে না, তাহা নহে। ভগবানের কাজ করিতে টাকার দরকার হয় না,—দরকার হয় প্রাণভরা ভক্তির। ভক্তিভরে ভগবান্‌কে ডাকিয়া নিয়ত কেবল বলিতে থাক— "ঠাকুর, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, অর্থ নাই, শক্তি নাই, তবু তুমি তোমার নিজের গুণে তোমার কাজ করাইয়া নাও। তুমি না করাইলে নিজের বলে কি করিয়া কি করিতে পারি প্রভো!"

অনেকেরই ধারণা, দেশের কাজ করিতে হইলে অনেক তোড়জোড় প্রয়োজন, অনেক আড়ম্বর চাই। অনেকের ইহাও ধারণা যে, ভগবানের কাজ করিতে হইলে ত্রিশ কুড়ি পঞ্চপ্রদীপ কিনিতে হইবে, চল্লিশ ঝুড়ি ধূপ-ধূনা-গুগ্ গুল চাই।

দেশের কাজও সোজা, ভগবানের কাজও সোজা। দেশকে বা ভগবানকে লক্ষ্যে রাখিয়া ছোট ছোট কাজ করিলেও দেশের বা

ভগবানের সেবা হয়। বড় বড় কাজ সকলের আয়ত্তে না থাকিতে পারে, ছোট ছোট কাজ সকলেরই সুসাধ্য। তুমি ভগবানের প্রীতি কামনা করিয়া তোমার সাধ্যমত ছোট ছোট কাজই করিও। তাহাতেই ভগবানের কাজ হইবে। আর, এইরূপেই বাকী জীবনটুকু কর অতিবাহিত।

খ্রীষ্টান মিশনরীদের হাসপাতালে এত সেবা-যত্ন পাইয়াছ, ইহা ভগবান্ যীশুরই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। তাঁর সেবকেরা মানব-সেবায় যেভাবে নিজেদের সমর্পণ করিয়াছেন, তাহারই ফলে পৃথিবীর নানা দেশে খ্রীষ্টের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহার অনুবর্ত্তীরা তোমাকে ঔষধ দিয়া, চিকিৎসা দিয়া, সেবা দিয়া বাঁচাইয়া তুলিলেন, তাঁহার প্রতি তুমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিও। প্রভুযীশুর এই নিষ্কাম সেবক-সেবিকাদের প্রতিও অন্তরের শ্রদ্ধা রাখিও।

ঠিক এই হাসপাতালটিতেই তোমার আরও এক গুরুভগিনী যক্ষ্মা চিকিৎসার্থ গিয়াছিল। সে আমাকে পর পর চারি পাঁচখানা চিঠিতে এই একটী আতঙ্কের কথা জানাইয়াছিল যে, হাসপাতালের সেবিকা সিষ্টাররা প্রতিদিনই তাহার ও অন্যান্য রোগীণীদের উপরে এই জুলুম চালাইতেছেন যে, প্রত্যেককে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। কাছাড়ের প্রত্যন্ত অংশে প্রতিষ্ঠিত এই সুন্দর যক্ষ্মা হাসপাতালটী এভাবে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের একটী মস্ত ঘাটিরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। তোমার সেই ভগিনী আরও লিখিয়াছিল যে, হিন্দুরা যেমন মনে ক'রে যে, যেভাবে যে ভগবানকে ডাকে, সেভাবেই সে ভগবানকে পায়, এই সকল সিষ্টাররা তাহা মনে করেন না। তাঁহারা

মনে করেন যে, প্রভু যীশুকে ভজনা না করিলে প্রত্যেককেই অনন্ত নরকে পচিতে হইবে এবং এই জন্যই হাসপাতালের প্রত্যেকটী রোগীণীর বিনা বিলম্বে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত। বারংবার কাতর ভাষায় তোমার সেই ভগিনীটী এই বিষয়ে তাহার কর্ত্তব্য জানিবার জন্য আমাকে পত্র দিতেছিল। পরে তাহার স্বামীও তাহার কার্য্যস্থল হইতে আমাকে এক কথাই লিখিল। আমি তখন আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম যে, নিজ নিষ্ঠা অটুট রাখিয়াই যেন মেয়েটী সুস্থ শরীরে হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে।

তোমার চিকিৎসা-কালে এরূপ কোনও ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত হয় নাই জানিয়া বুঝিলাম, হয়ত ঐ মিশনারী হাসপাতালের সকল সেবিকারাই ধর্ম্মবিষয়ে সমান অনুদর নহেন। এই সকল সেবিকাদের কোনও ত্রুটি যদি তোমার চ'খে পড়িয়া থাকে, তবে তুমি তাহা তাঁহাদের স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগহেতু উৎসাহের অত্যাধিক্য জ্ঞান করিয়া ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিও। ইহার কোনও অপব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই।

খ্রীষ্টান মিশনারীরা যদি তাঁহাদের আরাধ্য প্রভু যীশুর ভজন প্রচারের উদ্দেশ্যেই হাসপাতাল খুলিয়া রুগ্ন আর্ত্তের সেবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের এই সেবাটা মিথ্যা হইয়া যায় না। কেহ হয়ত সত্যই খ্রীষ্টান হইল, কেহ বা হয়ত কিছুতেই খ্রীষ্টান হইল না, কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই ইহা ত' সত্য হইয়া রহিল যে রোগে সে ঔষধ, পথ্য, শুশ্রূষা পাইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আরোগ্যও লাভ করিয়াছে! সাম্প্রদায়িক-অভিসন্ধি-বর্জ্জিত নিষ্কাম সেবা অবশ্যই

মহত্তরা, কিন্তু রুগ্নেরা কেহ কেহ প্রভু যীশুর নৈষ্ঠিক উপাসক হউক, এই কামনা করিয়া সেবা করিলে কি সেবা অসেবা হইয়া যাইবে? এই কারণেই মিশনারী হাসপাতালগুলির বিরুদ্ধে মানসিক রুক্ষতা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার যুক্তি দেখিতেছি না।

প্রেম ইঁহাদিগকে সেবার শক্তি দিতেছে। হয় তাহা মানব-প্রেম, নয় ইহা যিশুর প্রেম। যে প্রেমই হউক, প্রেম হইতে যে সেবা উৎসারিত হয়, তাহা নিন্দনীয় নহে। অবশ্য তোমরা যদি কখনও একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতে পার, তাহা হইলে সেখানে সেবা-দানের পশ্চাতে এই বুদ্ধিটা কখনও রাখিও না যে, রুগ্ন ব্যক্তিরা নিজ নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করুক।

ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীকে নিজধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করার পশ্চাতে সাধারণতঃ হিসাবের এই একটা নিদারুণ ভুল থাকে যে, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি ভগবানের কৃপা বর্ষিত হইবে না। আরও একটা ধারণা থাকে যে, অন্যান্য ধর্ম্ম সবই অসত্য ও অসার্থক, একমাত্র আমার ধর্ম্মটীই সত্য এবং সার্থক। তোমাদের মনে কিন্তু এসব ধারণা থাকিতে পারে না। কারণ, তোমরা সকল ধর্ম্মকেই সত্য বলিয়া জ্ঞান কর এবং একাগ্র সাধকের পক্ষে যে-কোনও ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরদর্শন সম্ভব বলিয়া মনে কর।

অবশ্য, তাহা সত্ত্বেও জীবের এমন প্রয়োজন আসিতে পারে যে, প্রচলিত ধর্ম্মমতের অনুসরণকারীদের ঘরে লালিত-পালিত নরনারীরা অন্তরের পূর্ণতার আহ্বানে তোমাদের কাছে আসিবে। সেই সময়ে তাহাদিগকে সাহায্যে করিবার ভিতরে কোনও সাম্প্রদায়িকতা আছে বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই।

সেবা ও সাম্প্রদায়িকতা, এই দুইটী জিনিষ কখনো এক তালে চলিতে পারে না। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি নিয়া সেবা পরিচালন করিলে, যে আমার সম্প্রদায়ের নহে পরন্তু ভিন্ন দলের, তাহার সেবাকালে আমার মন, মুখ, হাত, পা একটু শিথিল হইবেই। ফলে আমার সেবায় অসম্পূর্ণতা আসিয়া যাইবে। সেবাধর্ম্ম পূর্ণ মানবিক বিবেচনায় প্রতিপালিত হইলে নিষ্কাম হইয়া যায়। তাহা অতি দ্রুত সেবককে ভগবানের সমীপস্থ করে। এই কারণেই সেবাবুদ্ধিকে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির অধীন বা উহার সহিত সংশ্রবযুক্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে।

"তোমরা যদি কখনও হাসপাতাল খোল" বলিয়া যে একটা কথা ফাঁদিলাম, তাহা শুনিয়া হয়ত মনে মনে হাসিবে আর বলিবে যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে লাথি-ঝাটা খাইতে খাইতে যাহাদিগকে স্বামী, স্বজন, পুত্র ও কন্যা হারাইয়া নিঃস্ব নিঃসম্বল হইয়া আসিয়া আশ্রয়-শিবিরে মাথা গুঁজিতে হইল সাপ্তাহিক "ডোলে"র কয়েক মুঠা কাঁকরযুক্ত চাউলের ভরসায়, তাহারা করিবে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা? আমি বলি, হাঁ মা, তাহারাই ইহা করিবে। কিছুদিন আগে তোমাদেরই শিবিরে একটী মেয়ে নিজের তাঁবুর এক কোণাতে একটী লাউ গাছ করিয়া সেই গাছের লাউ বেচিয়া বেশ কয়েকটা টাকা সমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যে এক সৎকার্য্যে দিয়াছিল। সে প্রমাণিত করিয়াছিল যে, নিঃস্বরা একেবারে নিঃস্ব নহে, ফাটকবাজারের জানিগঞ্জের দুই দশ জন ব্যবসায়ী অপেক্ষাও তাহাদের কলিজার জোর বেশী। এমনি ভাবের সম্বলহীনারাও মিলিত হইলে আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র সূচনায় বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারে। ক্ষুদ্র ভাবেও তোমরা যে-কোনও কাজ

আরম্ভই কর না, সকল ব্যাপারের গোড়ায় গলদ ত' সেইখানে! জীবে প্রেম, আত্মশ্রদ্ধা ও ভগবদ্বিশ্বাস নিয়া কাজে নামিলে একনিষ্ঠার গুণে ক্ষুদ্র আরম্ভও কল্পনাতীত বৃহৎ পরিণতি পায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩১শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার শিশুর শুভ অন্নারম্ভ কার্য্য করিতে অযথা অপব্যয় করিও না। একটী সমবেত উপসনার অনুষ্ঠান কর। প্রচলিত বিধিমতে তাহাতে খৈ, নারিকেলের নাড়ু, ফলমূল প্রভৃতির ভোগ নিবেদন কর এবং উপাসনান্তে অন্নের বা পায়সান্নের সহিত প্রসাদ মিশাইয়া সেই প্রসাদ মহানন্দ সহকারে শিশুর মুখে দাও।

অন্নপ্রাশন হইবে বলিয়াই যে উপাসনার নৈবেদ্যের মধ্যে পক্কান্ন-ভোগ সাজাইয়া দিবে, তাহা করিও না। সমবেত উপাসনাতে পক্কান্ন-ভোগ সাজান আমার নিষেধ করাই আছে। কেহ কেহ কোনও কোনও স্থানে এই নিষেধ অমান্য করিয়া নিজ নিজ স্বাধীন বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু ইহা অন্যায় হইয়াছে। বিনা কারণে কোনও একটা নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় না। যেখানে সমবেত ভক্তদের খেচরান্ন-প্রসাদ দিয়া আপ্যায়ন করা অবস্থাধীনে আবশ্যক, সেখানেও সমবেত

উপাসনার প্রসাদ নিয়া ভক্তি-ভরে তাহার সহিত মিশাইয়া দিলেই কাজ চলিতে পারে। এক হাঁড়ি পক্কান্ন নিয়া সমবেত উপাসনার ভোগ-নৈবেদ্যের সহিত সাজাইয়া দেওয়া অসঙ্গত।

নূতন জায়গায় আসিয়া তুমি প্রথমেই যে খুঁজিয়া নিয়াছ যে, এখানে তোমার সমভাবের ভাবুক কোথায় কে আছে, তাহাতে বড় সুখী হইলাম। একা একা বাস করিলে নিজের অন্তরের ভাবকে পরিপুষ্ট করিবার সুযোগ অনেক সময়ে থাকে না। ভক্তিমান ভাবুকদের সংসর্গে অন্তরের ভাব পুষ্ট হয়, অনেক সময়ে সাধনেও রুচি বাড়ে। অনাবশ্যক প্রজল্পে যাহারা সময়ক্ষেপ ক'রে না, এমন সমসাধকদের সংসর্গ জগতে কাহার না হিতদায়ক? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

৩১শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

হরি-ওঁ তোমার জপনীয় নাম নহে, ইহা তোমার কীর্ত্তনীয় নাম। কীর্ত্তনীয় নাম নিয়ত জপনীয় নামকে স্মরণ করাইয়া দেয়, ইহাই কীর্ত্তনীয় নামের বিশেষত্ব। এই কারণেই কীর্ত্তনীয় নামের এত সমাদর। কীর্ত্তনীয় নামও যে জপ করিলে কোনও ক্ষতি হইতে পারে, তাহা নহে কিন্তু একাভিনিবেশ অটুট রাখিবার জন্য জপনীয়

নামের সংখ্যা কখনও বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। একটী মাত্র নামই নিয়ত জপিবে, শয়নে স্বপনে, জাগরণে ভ্রমণে সকল সময়ে একটী মাত্র নামকেই ইষ্টতম নামরূপে মনন করিবে। ইহা না হইলে সাধন-পথে দুর্ব্বলতা আসে, একাগ্রতা কমে।

নাম করিতে করিতে তন্দ্রা আসে, ইহা ত' ভাল কথা। তন্দ্রার দ্বারাই বুঝা যায় যে, মনের একটা স্থিরতা আসিতেছে, বহিরাভিনিবেশ কমিতেছে। কিন্তু তন্দ্রা একটা অতি তরল অবস্থা। মন যদি দীর্ঘকাল তন্দ্রাবস্থাতেই পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে অবচেতন মানসে বিধৃত হাজার রকমের পূর্ব্বসংস্কার নানা বিচিত্র স্বাপ্নাবেশের সৃষ্টি করিয়া ধ্যানাবেশ প্রহত ক'রে। তাই এই তন্দ্রাবস্থাতেও অবিরাম নাম করিয়াই যাইতে হয়। তাহার ফলে হঠাৎ তন্দ্রা টুটিয়া যায় এবং মন পরিপূর্ণ ধ্যানে অটল হয়। তন্দ্রা একটা তামসিক অবস্থা বটে কিন্তু ইহাকেও ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই।

আমি যদি তোমাকে ধ্যানে দেখা না দেই, তাহা হইলে তুমি গৃহত্যাগ করিয়া অজানা দেশে চলিয়া যাইবে লিখিয়াছ। মজার কথাই বটে! তোমার গৃহেই যদি আমাকে না পাও, তাহা হইলে বাহিরে যে পাইবেই, তাহার কি কিছু নিশ্চয়তা পাইয়াছ? বৃথাই দেশ ভ্রমিয়া কি লাভ? লাভ থাকিলে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতেও তোমাকে বাধা দিব না। কিন্তু গৃহে বসিয়া আমাকে পাইবে না, এমন কথাটা তোমাকে কে শিখাইল?

তোমার সহিত আমি অভিন্ন হইয়া রহিয়াছি। ওতপ্রোতভাবে তোমার সহিত আমি মিশিয়া রহিয়াছি। তোমার দেহ, মন, প্রাণ,

আত্মায় আমি আমার দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা লইয়া নিয়ত বিরাজ করিতেছি। আমাকে পাইতে বেশী দূরে যাইতে হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরি-ওঁ কলিকাতা
৩১শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ জানিও।

ভক্তেরা কর্ম্ম করিবেন না, কর্ম্মীরা ভক্ত হইবেন না, জ্ঞানীরা ভক্তদের অবজ্ঞা করিবেন, ভক্তেরা জ্ঞানীদের নিম্বফলের মত অখাদ্য জ্ঞান করিবেন,—এই সকল উক্তি-প্রত্যুক্তি মধ্যযুগের ধর্ম্মজীবনের উপযুক্ত ছিল। এই যুগে প্রকৃত সাধকের জীবনে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হইবে। অজ্ঞানের কর্ম্ম অপকর্ম্ম। অজ্ঞানের ভক্তি অন্ধ-ভক্তি। অকর্ম্মীর জ্ঞান চলচ্ছক্তিহীন জড়। অভক্তের জ্ঞান মরুভূমির শুষ্ক বালুকা-বিস্তর। তিনকে মিলাইয়া এক,—ইহাই নবযুগের আদর্শ।

যাঁহারা জ্ঞান-ভক্তি বিলাইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে নিজ হাতে কর্ম্ম করেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের অনুসরণকারীরা কর্ম্মবর্জ্জন করিবেন, ইহা এই যুগের যোগ্য সন্দেশ নহে।

এক দল লোক আদর্শের বাণী বিলাইয়া যাইবেন, অন্য আর

এক দল আসিয়া সেই বাণী অনুসরণ করতঃ নানা বিরাট বিরাট লোককল্যাণকর অনুষ্ঠান করিবেন, ইহা নিয়ম হিসাবে সমর্থনীয় হইতে পারে না। যিনি আদর্শ দিবেন, তিনি কাজেও হাত লাগাইবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৩১শে বৈশাখ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার অদর্শনে তোমার মন চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। শুনিতে কতই না ভাল লাগে। আমাকে ভাল না বাসিলে আমার দর্শনই বা কামনা করিবে কেন, অদর্শনে চঞ্চলই বা হইবে কেন?

কিন্তু আমি যে বাবা নিয়ত তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। তোমার দেহে, তোমার মনে, তোমার প্রাণে আমি ছাড়া আর কে নিত্য-নিয়ত অবস্থান করে? তোমার হৃৎস্পন্দনে, শ্বাসের বায়ুতে কে নিয়ত নিজের উপস্থিতিতে তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেয়? কে তোমার অন্তরে বাহিরে অচ্ছেদ্য ভাবে অলোপ্য ভাবে সর্ব্বক্ষণের জন্য বাস করিতেছে? তুমি "আমি" "আমি" বলিয়া কাহাকে নিজের সহিত নিয়ত অভিন্ন ভাবিতেছ? আমি তোমাতে, তুমি আমাতে, ইহাই পরম

সত্য, চরম জ্ঞান। এই সত্যে এই জ্ঞানে তুমি প্রতিষ্ঠিত হও। ইহাই অমরত্বের পথ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

টাকাকড়ি আমি তোমাদের নিকটে চাহি না। যাহা চাহি, তাহা কোনও পার্থিব বস্তু নহে। অথচ এই পার্থিব জগতের সংস্পর্শেই তাহার প্রকাশ। প্রেম, শ্রদ্ধা, সেবা পার্থিব জগতের মানুষের সংস্পর্শেই জন্মে অথচ এই জিনিষগুলি নিতান্তই স্বর্গীয়। প্রেমে তোমরা ভরপূর হও, শ্রদ্ধায় হও ডগমগ, সেবায় হও অনুপম। পৃথিবীর মানুষকে সেবা করিতে গিয়া তাহার মধ্যে দর্শন কর ব্রহ্মাণ্ডপতি পরমেশ্বরকে।

আমি সত্য সত্য ইহাই তোমাদের নিকটে চাহি।

তুমি গান্ধী-পাঠচক্রে ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে একটী নিবন্ধ পাঠ করিয়াছ এবং সেই নিবন্ধে আমার রচনা হইতে অনেক জিনিষ গ্রহণ করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। মহাত্মা গান্ধী ব্রহ্মচর্য্যের উপরে বড়ই গুরুত্ব আরোপ করিতেন। ভারতের অধিকাংশ চিন্তাশীল মনীষী এখনও ব্রহ্মচর্য্যকে অসামান্য শক্তির উৎস বলিয়া অন্তরে বিশ্বাস করেন। সত্যই ব্রহ্মচর্য্য আলোচনীয় বিষয়।

শুধু আলোচনীয় বিষয় নহে, ব্রহ্মচর্য্য আচরণীয় বিষয়। যাহার আচরণে কুশল, তাহার আলোচনাতেও কুশল। তোমার নিবন্ধের বিষয়ে বিস্তারিত অবগত হইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আমার চিন্তাকে তোমার চিন্তা বলিয়া চালাইয়া দিয়াছ, ইহাতে কোনও দোষ হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। আমি হয়ত কোনও কোনও দিকে একটু নূতন ভঙ্গীতে বিষয়টাকে দেখিয়াছি কিন্তু তাই বলিয়া ইহা বলা চলে না যে, আমারও সকল চিন্তা মৌলিক। আমারও অধিকাংশ চিন্তা পূর্ব্বতন আচার্য্যদের চিন্তার পরোক্ষ প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু এই বিষয়ে নিজের ঋণ স্বীকার করিবার সুযোগ আমারও হয় নাই। কারণ, আমি নিজেও বিচার করিয়া বলিতে পারিব না যে, আমার কোন্ কোন্ চিন্তাধারা কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছে। জগতের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ভাবুকেরাই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অন্যান্য ভাবুকদের কাছে ঋণী। নিজেকে মৌলিকতার অবতার বলিয়া অহঙ্কার করা প্রকৃত ভাবুকের কখনো খাটে না। আমি আমার সমসাময়িক কালের বা ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের কোনও দিক্‌পাল পুরুষের রচনাই পাঠ করি নাই, করিয়া থাকিলেও হয়ত এই পুস্তকের এক পাতা আর ঐ পুস্তকের দেড় পাতা। যুগন্ধর পুরুষ ও দিক্‌পাল কবিদের রচনা পাঠের প্রতি আমার এই অনাসক্তি তাঁহাদের প্রতি কোনও প্রকার অশ্রদ্ধা বশতঃ নহে। আমার নিজের স্বাধীন চিন্তার ক্রমাগ্রগতির পথে অনর্থক অপরের প্রভাব আসিয়া পড়িয়া আমাকে বুঝিয়া বুঝিয়া পথ চলিতে বাধা দিয়া হঠাৎ কোনও চিন্তা-বিশেষের কিঙ্কর করিয়া না

ফেলে, তদ্বিষয়ে সতর্কতাই আমাকে সমসাময়িক বা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মহান পুরুষদের রচনা পড়িতে বিরত করিয়াছে। তথাপি খুঁজিলে দেখিতে পাইবে যে, এই সকল মহান পুরুষের চিন্তার সহিত হয়ত আমার চিন্তার কত স্থানে মিল রহিয়াছে। অপরের অনুকরণ অনুসরণ না করিয়াও এই ভাবে পরস্পরের মিল নিতান্ত স্বাভাবিক। তাহার কারণ এই যে, প্রত্যেক চিন্তানায়কই নিজ নিজ প্রকৃষ্ট চিন্তাগুলির সূত্র আবিষ্কার করিয়া থাকেন চতুর্দ্দিকের মানবগোষ্ঠীর চিন্তার সহিত নিজের চিন্তার সঙ্কর্ষণে। কিন্তু চতুর্দ্দিকের মানবেরা প্রায় একই আকর হইতে নিজ নিজ চিন্তামণি আহরণ করিয়া থাকে।

এই যে তোমার নিবন্ধ-পাঠ, তাহার একটা শুভপ্রভাব শ্রোতাদের মনের উপরে পড়িয়াছে জানিয়া খুবই সুখী হইয়াছি। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনীয়তাবোধ অন্তরে জাগিলে ব্রহ্মচর্য্য পালনের দিকে উদ্যমও যে মা স্বাভাবিক। সেই উদ্যম অন্ততঃ কাহারো কাহারো ভিতরে জাগিয়াছে জানিলে আমার আনন্দের অবধি থাকিবে না। গান্ধী-পাঠচক্রে যোগদানকারী সজ্জন ও মহিলাদের সম্পর্কেই আমার এই মন্তব্য সীমাবদ্ধ নহে। আমি তোমাদের অখণ্ড-মণ্ডলীটারও কথা ভাবিতেছি।

অখণ্ডমণ্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের সংখ্যা তোমাদের ওখানে কম নহে। বিশেষতঃ ঐটী হইতেছে আসামের প্রধানতম এক সহর। সমবেত উপাসনাতে ও ব্যক্তিগত সাধন-ভজনে তোমাদের অনেকের যে মনোযোগ একেবারেই নাই, তাহার কারণ কিন্তু সময়াভাব নহে। প্রকৃত কারণ

ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। ব্রহ্মচর্য্য পালনে যত্নশীল ব্যক্তির সাধনশীলতা সহজাত হইয়া থাকে। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন সকলের সুসাধ্য না হইতে পারে কিন্তু সীমাবদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য পালন কে না করিতে পারে? গৃহীরা দিনক্ষণের বিচার পরিহার করিয়া ক্ষণে ক্ষণে উন্মত্তবৎ ব্যবহার করিতেছে, তাহারা যদি শনি, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি এই চারিটি বার বাদ দিয়া অমাবস্যা পূর্ণিমা পঞ্চমী একাদশী চতুর্দ্দশী এই আটটী তিথি বাদ দিয়া চলিবার নিয়মও পালন করিতে পারে, তবে তাহাও এক আংশিক ব্রহ্মচর্য্য সাধনাই বটে। আংশিক ব্রহ্মচর্য্যে আংশিক শুভফল জীবনের উপরে বর্ত্তাইবেই। এক কণা ব্রহ্মচর্য্যের ফলে এক কণা হইলেও মনোবল বাড়িবেই। ব্রত নিয়া হঠাৎ অনিচ্ছায় ব্রতভঙ্গ হইয়া গেলেও তার মধ্য দিয়া একপ্রকার বল আসে। ব্রত না নিয়া যথেচ্ছাচার অপেক্ষা তাহা ভাল। তবে যে যতটুকু বল রাখে, তাহার ততটুকুর মত ব্রতই গ্রহণ করা উচিত। অত্যাধুনিক লেখকেরা পত্র-পুস্তিকাদির মারফৎ ব্রহ্মচর্য্যের বিরুদ্ধে যে বিপুল আন্দোলন পরিচালন করিতেছেন, তাহা প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাঁহাদের অজ্ঞতা হইতে প্রসূত। ব্রহ্মচর্য্য বলেরই উৎস, দুর্ব্বলতার জনক নহে। ব্রহ্মচর্য্য অমৃতেরই সরোবর, বিষের আকর নহে। ব্রহ্মচর্য্য প্রেমেরই প্রাচুর্য্য হইতে আসে, ক্লৈব্য বা পুরুষত্বহীনতার ফল নহে।

তোমাদের মণ্ডলীর প্রতিটি সভ্য-সভ্যার মধ্যে এই ব্রহ্মচর্য্যের ভাবটীকে সম্প্রসারিত কর। প্রতিজনকে ভক্তিপূর্ব্বক আমার বা অপরের লিখিত ব্রহ্মচর্য্যের বহিগুলি পড়িতে বল। প্রত্যেককে সঙ্কল্প করিতে বল যে, প্রতিজনকে নিজ নিজ জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকের নরনারীদের

মনে সেই ভাবটী প্রচারের চেষ্টা করিতে হইবে। আমার কাছে দীক্ষা নিলে কেবল মন্ত্র নেওয়াই হয় না, চারিদিকের প্রতিবেশ যাহাতে সাত্ত্বিক ও সুষমামণ্ডিত হইতে পারে তজ্জন্য প্রতিজনকে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিশ্রমও করিতে হইবে। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মচর্য্য-পালনের চেষ্টার মধ্য দিয়া তোমাদের সাধন-রুচি, সাধন-বল ও সাধন-গতি বাড়িবে। এত বড় একটা স্বার্থ যাহা দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাকে অবহেলা করার মতন মূর্খতা কি আর কিছু আছে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাকে আশ্রম চালাইতে জন-সাধারণের একাংশের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হইতেছে জানিয়া বড়ই চিন্তিত হইলাম। গায়ের জোরে আশ্রমের জমি দখল করিতে চাহে, ফসল কাটিয়া নিতে চায়, আর তাহার সহিত সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যোগাইয়া যাইতেছে তোমারই নিজের ভ্রাতাভগিনীরা, এ সব সংবাদ ত' অভাবনীয়।

আমি মনে করি, আশ্রম থাকুক আর যাউক, তুমি ক্ষত্রিয়-

মনোভাব বর্জ্জন করিয়া চলিলে ভাল করিবে। যেখানে তোমার নিজের ভ্রাতাদের মধ্যেই পারস্পরিক আত্মদ্রোহ, সেখানে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী আততায়ীরা জোর-জবরদস্তি করিতে আসিলে তুমি একা তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিবে কেন? আশ্রমে হরিনাম জাগাইয়া রাখাই তোমার প্রধান কাজ, আশ্রমের জমি আগলান তার চেয়ে অনেক ছোট কর্ত্তব্য। জমি রহিল, গাভী রহিল অথচ হরিনাম রহিল না, এমন আশ্রম দিয়া কি কাজ হইবে?

এই আশ্রমে তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী যিনি কর্ম্মীরূপে ছিলেন, তাঁহাকে ত' কখনও জনসাধারণের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে দেখা যায় নাই। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা একই ছিল, তোমার ধর্ম্মভ্রাতারাও একই ছিলেন, তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মী নীরবে সকল কাজ করিয়া যাইতে পারিলেন আর তোমাকেই প্রতিজনের সহিত কলহে লিপ্ত হইতে হইতেছে, ইহারই বা কারণ কি?

এই কারণগুলি তুমি অনুসন্ধান কর। ভূমি, গাভী, গৃহ, মন্দির কিছুই জগতে স্থায়ী নহে। স্থায়ী হইতেছে ভগবৎ-প্রেম। অস্থায়ী জিনিষগুলির উপরে অধিক গুরুত্ব দান না করিয়া শাশ্বত সত্য ভগবৎ-প্রেমের উপরে গুরুত্ব প্রদান কর।

তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মী খুব একটা প্রেমিক পুরুষ ছিলেন, এমন কথা কেহ বলিবে না। তিনি আশ্রমের সম্পূর্ণ আয় আশ্রমেরই কাজে ব্যয় করিতেন কিনা কিম্বা বর্ত্তমানে তিনি যে বিপুল পরিমাণ অর্থ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সরাইয়া নিয়া ত্রিপুরা রাজ্যে নিজের কর্ত্তৃত্বে ও

সত্ত্বাধিকারে এক আশ্রম স্থাপন করিতে যাইতেছেন, তাহার প্রায় সম্পূর্ণটাই এই আশ্রমের আয় হইতেই বৎসরের পর বৎসর কৌশল করিয়া জমান হইয়াছে কিনা, এই সকল বিষয় নিয়া এখন আর গবেষণা করিবার দরকার নাই। তাঁহার রাজত্বকালে আট নয় বৎসরের মধ্যে আয়ব্যয়ের কোনও খবরাখবর বা হিসাব-পত্র কখনও কেন্দ্রে আসে নাই। কিন্তু লোকটীর মুখের ভাষা ছিল মিষ্টি, কর্কশ-ভাষণে তিনি স্থানীয় বন্ধুদের মনে বিদ্বেষের রেখাপাত করেন নাই। এই একটী গুণের জন্য স্থানীয় অনেক লোকেই তাঁহার কাজকর্ম্মের দোষ-গুণ নিয়া অধিক আলোচনায় অগ্রসর হন নাই।

এই কর্ম্মীটীর চরিত্র হইতে এই একটী ভাল জিনিষ তোমার শিখিবার আছে।

যাহার নিকট যাহা শিখিবার আছে, তাহার কাছ হইতে তাহা শিখিয়া লও। সেই লোকটীর সহিত হয়ত তোমার সম্বন্ধ আদা-কাঁচ-কলার হইতে পারে, কিন্তু তাহার গুণটুকু কেন তুমি অনুকরণ করিবে না?

তোমার ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী নোয়াখালীর ফতেপুর হইতে আমাকে পত্র দিয়াছেন, তুমি নাকি শাসাইয়াছ যে, তুমি আশ্রমের ঘরে আগুন লাগাইয়া চলিয়া যাইবে, আমি যেন সাবধান হই।

তুমি কখন মনের দুঃখে কাহাকে কি বলিয়াছ, তাহা নিয়া এই যে আক্রোশমূলক পত্র, ইহার আমি একটী কাণাকড়ি মূল্যও দেই নাই। তোমাকে যে কত কষ্টের মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে, তাহা আমি বুঝি। কিন্তু তথাপি এমন কথা মুখে কখনও উচ্চারণ করিও

না, যাহার কুব্যাখ্যা সহজেই হইতে পারে। যেই আশ্রমটীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া চলিতেছ, এই সেই দিন পাঠান সৈনিকদের প্রহার ও ঘুষি খাইয়া রক্তবমন পর্য্যন্ত করিয়াছ; সেই আশ্রমটীর ঘর-দুয়ার তুমি জ্বালাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতে পার, এমন কথা পাগলেও বিশ্বাস করিবে না। তবু এমন কথা মুখে আনিতে নাই। মুখটাকে তুমি বাবা সামলাও। মুখের মতন বন্ধু নাই, মুখের মত শত্রুও নাই। যে কথা মিষ্টি করিয়া বলিতে পারিবে না, তাহা হইতে বরং বিরত থাক।

একথা মনে করিও না যে, লোকের সহিত মিষ্টি করিয়া কথা বলিলে নিজের সম্মান কমে। মধুরভাষিতা আর তোষামোদ এক কথা নহে। স্বার্থে বা পরার্থে সকল সময়েই মধুরভাষী হইও। রুক্ষ্ম, রূঢ়, কঠোর বাক্য সত্য-ভাষণেও বর্জ্জনীয়। সত্য ভাষণের প্রকৃত উদ্দেশ্য লোককে সৎপথে পরিচালিত করা। তুমি যদি হুল ফুটাইয়া সত্য কথা বল, তবে কে তোমার প্রেরণায় সৎপথে চলিতে রাজি হইবে? অন্তরে প্রেমের কর সঞ্চার। সকলকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর। ভালবাসার গুণে তোমার রুক্ষ্মভাষিতার নাশ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া সুখী হইলাম। আমার সন্তানের মনের বল এমনই থাকা উচিত। আজীবন যে আদর্শের পূজা করিয়া চলিয়া আসিতেছে, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তাহারই অনুসরণ করিয়া তোমাদের চলিতে হইবে, কারণ এই আদর্শ জগতের শাশ্বত কুশলের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা ও বিশ্বময় প্রতিজনের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ, ইহাই তোমাদের আদর্শ। এ আদর্শের পতাকা কখনই অবনমিত করা চলে না।

আসুক না পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা, আসুক না কল্পনাতীত বিঘ্ন-বিপত্তির ঝঞ্ঝা, তোমাদিগকে তোমাদের ভজন-পথ হইতে বিচ্যুত করিবে কে? কার অত বড় সাধ্য আছে?

তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রবুদ্ধ হউক সহস্র কোটি অবিশ্বাসে দোদুল্যমানচিত্ত দুর্ব্বলের দল, ঘুচুক তাহাদের মোহতন্দ্রা, অপগত হউক তাহাদের আলস্য ও অবশতা, বিদূরিত হউক জগদ্ব্যাপী লালসা আর আতঙ্ক। তোমারা অমৃত পান করিয়া প্রতি জনে অমর হও আর জগদ্বাসী প্রতি জনকে তাহা বিতরণ কর অকৃপণ চিত্তে।

সত্য, মন্ত্র ও সাধনা কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী-বিশেষের একচেটিয়া

হইতে পারে না। যে সাহসী, যে সজ্জন, যে সাধনেচ্ছু, যে সংযমী, তাহারই ইহাতে অধিকার। বিশ্বের সকলে সত্যদ্রষ্টা হউক, মন্ত্রদ্রষ্টা হউক, সাধন-সিদ্ধ হউক। কোটি কোটি পথ-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া এই ভাবে জগতে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে মৈত্রী স্থাপিত হউক।

সকলের ধন সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া ধনসমতার মধ্য দিয়া মানবজাতির সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। সেই চেষ্টা অযৌক্তিক বা অনাবশ্যক নহে। কিন্তু সকলের মধ্যে সাধনার শক্তিকে সমভাবে বিকশিত করিয়া, সকলের আধ্যাত্মিক দিব্য-দৃষ্টির উন্মেষ সাধন করিয়া, সকলের আত্মা যে এক আত্মা, সকলের জীবন যে এক জীবন, সকলের গতি যে এক গতি, সকলের লক্ষ্য যে এক লক্ষ্য, এই সত্যের সুপ্রতিষ্ঠা করিয়া সকলের প্রতি সকলের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করিয়া, সকলের প্রতি সকলের প্রাণভরা প্রেম প্রতিষ্ঠা করিয়া আভ্যন্তর সাম্যকে স্নিগ্ধ সুষমায় মণ্ডিত করা তাহার অপেক্ষা কম কথা নহে। মনে প্রাণে যদি জগদ্বাসীকে আপনার বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে ভেদ-বৈষম্যের মূল যে আপনি উৎপাটিত হইয়া যায়।

যাঁহারা বহিরঙ্গ সাম্যের প্রতিষ্ঠার জন্য নানা সৎপ্রয়াসে ব্রতী রহিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রশংসনীয় কাজ করিয়া যাইতে থাকুন। কিন্তু কাহার কত ধন আছে বা কাহার কত নাই, তাহা নিয়া দুশ্চিন্তা না করিয়া কাহার কত প্রেম আছে, তোমরা তাহার খোঁজ কর। জগতের সকল প্রেমিককে তোমরা একত্র কর, জগতের সকল

অপ্রেমিককে তোমরা প্রেমিক কর। প্রেমের পরশে মানুষের অন্তরের হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, লুণ্ঠনপ্রিয়তা, দুর্ব্বলের উপরে অত্যাচার করিবার স্পৃহা বিনষ্ট কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম কিন্তু আংশিক অঙ্গহীন হইয়া জন্মিয়াছ জানিয়া ব্যথিত হইলাম। তবে তোমরা এই বিষয় নিয়া দুঃখে মুহ্যমান হইও না। ভগবান যাহাকে একটা অঙ্গে হীন করেন, তাহাকে অন্যান্য অনেক দিক দিয়া দাক্ষিণ্যে ভরিয়া দেন। বড় হইলে হয়ত দেখিবে, এই শিশু যোগ্য লালন-পালন-শিক্ষা পাইলে অসামান্য পুরুষ হইবে। শুনিয়াছি, এক জন্মান্ধ ব্যক্তি আজ ভারতীয় লোকসভায় সদস্যরূপে জনসেবা করিতেছেন এবং দিল্লীর সুপ্রীম কোর্টে আইন-ব্যবসায় চালাইতেছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে সাহস ও উৎসাহ সঞ্চয় কর।

যাহাকে অসম্পূর্ণ এক বাম হস্ত লইয়া ভূমিষ্ঠ হইতে হইল, জন্মের অনেক পূর্ব্বেই তাহার জন্য এই ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া

রহিয়াছিল। সেই ভাগ্য-বিধাতা তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম। জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীর কর্ম্মফলও ইহার সহিত সংযুক্ত ছিল। নতুবা নির্দ্দিষ্ট ঔরসে নির্দ্দিষ্ট গর্ভে তাহার আবির্ভাবের কোনও হেতু ছিল না। তোমাদের তপস্যায় ছিল ত্রুটি, তাই ত্রুটিযুক্ত দেহ লইয়া এক জীব তোমাদের পুত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইল।

কিন্তু একথা মনে করিও না যে, অতীতের কর্ম্মই তোমাদের চিরকাল কলুর বলদের মত চোখে ঠুলি দিয়া চালাইয়া নিয়া যাইবে। অতীত কর্ম্মের ফলে যে ক্ষতি সুরু হইয়া গিয়াছে, তাহার কতকটা এখন ভুগিতেই হইবে কিন্তু বর্ত্তমানের সাধনা প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তম হইতে থাকিলে এই ক্ষতি ক্রমশঃ বাধাপ্রাপ্ত হইবে। পরে আস্তে আস্তে সমস্ত অতীত কর্ম্মফল খণ্ডাইয়া যাইবে। সুরমা আর বরাকে বন্যা সুরু হইলে যেমন প্রতীকার-চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহ বা জনপদ নিরাপদ হয় না, পরন্তু প্রতীকার-চেষ্টা অবিরাম চালাইতে আস্তে আস্তে বন্যার উৎপাত হইতে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষার পথ বাহির হয়, ঠিক তেমনি সাধন করিতে করিতে অতীতের কর্ম্ম ও তাহার ফল একটু একটু করিয়া প্রশমিত হইতে থাকে। ধৈর্য্য ধরিয়া দীর্ঘ প্রযত্নে সাধন চালাইয়া যাইতে হয়।

সাধন বলিতে বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ উভয় সাধনই বুঝিবে। শারীরিক শুচিতা, আরোগ্য-বিধান প্রভৃতিকে বহিরঙ্গ সাধন নাম দিতে পার। আত্মার আত্মা শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াকে অন্তরঙ্গ সাধন বল। অন্তরঙ্গ সাধনে জন্মজন্মের পাপ কাটিয়া যায়। বহিরঙ্গ সাধনে বর্ত্তমান শরীরের সঞ্চিত গ্লানি কাটে। সুতরাং উভয়ই প্রয়োজন।

তোমার নবজাত পুত্রের আংশিক বিকলাঙ্গতার জন্য হতাশ হইয়া পড়িও না। যত্ন করিয়া তাহাকে লালন-পালন কর। সে বড় হইয়া উঠিলে শল্য-চিকিৎসার দ্বারা তাহার অনেকটা উন্নতি হইতে পারে। আজকাল অস্ত্রোপচার-বিদ্যা এত উন্নত হইয়াছে যে, আগে যাহা অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, আজ তাহা অতি সরল হইয়া গিয়াছে। দুশ্চিন্তা না করিয়া প্রেমবশে বিকলাঙ্গ পুত্রের সেবাযত্ন কর আর নিয়ত ঈশ্বর স্মরণ কর। ঈশ্বর-কৃপায় সে বিকলাঙ্গ হইয়াও জগতের শ্রেষ্ঠ মহামানবে পরিণত হইতে পারে।

সংসারটীকে আর তোমাদের ভোগের সংসার রাখিও না। ইহাকে ভগবানের সংসারে পরিণত কর। সকল কাজ সমাধা কর একমাত্র ভগবৎ-প্রীতিকে লক্ষ্য রাখিয়া। ইন্দ্রিয়-ভোগ ও ইন্দ্রিয়-সংযম সব-কিছু নিয়ন্ত্রিত হউক, একমাত্র ভগবৎ-প্রেমের প্রেরণায়। তোমাদের আহার, নিদ্রা, সঙ্গীত, ব্রতপালন সব-কিছু এই একটী লক্ষ্যের মুখপানে তাকাইয়া চলুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এই কয়দিন এখানে একটা কাজের হিড়িক গিয়াছে। অপরের

নিকট যাহাই হউক, তোমাদের ভ্রাতা-ভগিনীদের নিকটে এই অনুষ্ঠানগুলি উৎসবের সমার্থবাচক। কিন্তু ছেলেমেয়েরা এক অদ্ভুত মনোভঙ্গীর দ্বারা চালিত হইল। নিতান্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া এবং আশ্রমেই সমর্পিত-জীবন কর্ম্মীরা ব্যতীত আর সকলে ব্যাপারটাকে আশ্রমেরই আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লইল। পারিল না ইহারা দুই চারিটা দিন অফিস হইতে ছুটি লইতে, পারিল না ইহারা দুই চারিটা দিন দোকানের বেচাকেনা কম করিতে। যে ব্যাপারে আশ্রমের সম্মান ও সম্পদ এক সঙ্গে জলে ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, সেখানে ইহারা সকলে রহিল এক যোজন দূরে সরিয়া। পাঁচ শত পত্র ডাকে দিয়া ইহাদের পঞ্চাশ জনকে কাছে আনা যায় নাই। এইরূপ এক আবহাওয়ার ভিতর দিয়া তোমাদের কলিকাতার সপ্তাহ পার হইল।

তোমরা কি আশা করিতে চাহ যে, এই সকল কর্ম্মীদের বাহুবলের উপরে নির্ভর করিয়া আর কোনও বৃহৎ কর্ম্মের পরিকল্পনা হইবে?

এই প্রশ্নটা এখন খুব আলোচনা হইতেছে। চিন্তাশীল কর্ম্মীরা ভাবিতে সুরু করিয়া দিয়াছে যে, শহরগুলির মধ্যে মানুষের মন যে পরিমাণ ফাঁকী-পরায়ণ হয়, তাহাতে সেখানে মহতী প্রত্যাশা কি করিয়া করা যাইতে পারে? দীক্ষা দিলাম, শিষ্য করিলাম, এইটুকুই কি আমার জীবনের চরম কর্ত্তব্য? আর কিছু কি করিবার ও করাইবার নাই?

তোমরা আমার সহস্র সহস্র সন্তান, কিন্তু হয়ত তোমাদের বাহু নাই। বাহু থাকিলে আমার বর্ষীয়ান্ বাহুযুগলের সঙ্গে কি তোমাদের বাহুর সংযোগ হইত না? বাহু তোমাদের থাকিলে তাহা বস্ত্রের আড়ালে লুকাইয়া রাখিতেছ কি করিয়া?

যেখানে যে বিপর্য্যয় ঘটিতেছে, ছুটিয়া আমাকেই যাইতে হইতেছে। তোমরা অগ্রসর হইয়া আসিতেছ কৈ? চরিদিকে তৃষ্ণার্ত্ত মানব "জল" "জল" করিয়া চীৎকার করিতেছে, কূয়ার দড়িতে তোমরা হাত লাগাইতেছ না। কেন তোমাদের এই আলস্য, কেন তোমাদের এই অবসাদ, কেন তোমাদের এই উদাসীন অবহেলা? তোমরা যে মানুষ, বৃহত্তর মনুষ্য-সমাজের প্রতি যে তোমাদের কর্ত্তব্য আছে, কেবল নিজের ক্ষুদ্র সংসারটুকুর ভালমন্দ লইয়া লাগিয়া থাকাই যে তোমাদের পরম-পুরুষার্থ হইতে পারে না, এই কথা কেন আবার বুঝাইয়া বলিতে হইবে?

আমার তীক্ষ্ণ-ভাষণে তোমাদের মনে ক্লেশ হয় কিন্তু আমার স্নেহ-ভাষণে কেন তোমাদের প্রাণে প্রেমের জোয়ার বহে না? কত ভালবাসিয়া তোমাদের এক এক জনকে বুকে টানিয়া আনিয়াছি, সেই ভালবাসাটা কি মিথ্যা হইয়া গেল?

তবে একটা কথা বিশ্বাস করিও যে, আমি কোনও অবস্থাতেই হাল ছাড়িয়া দিব না। ক্ষোভ, বিরক্তি, অসহিষ্ণুতা আমার চরিত্রে যথেষ্টই আছে কিন্তু নাই হতাশা। সমগ্র ধরণী প্রলয়-সলিলে ডুবিয়া যাইবার পরেও আমি আমার আশায় সুস্থির রহিব। প্রত্যাশা না করিতে পারি কিন্তু আশা ছাড়িব কেন?

এই সময়ে একবার তোমরা নিজেদের অন্তরের পানে তাকাও। বিষয়-বাসনার ক্রীতদাস রূপে অনন্তকাল ধরিয়াই চলিলে ত' হইবে না। নিজের ভিতরে তাকাইয়া নিজের স্বরূপ চিনিয়া নিজের শক্তিতে বাসনার দাসত্ব-বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানুষের মত চলতে শিখ।

বলিতে গেলে তোমরা অধিকাংশেই কোনও সাধন-ভজন কর না। এই জন্যই তোমাদের অন্তর কোমল হইতেছে না। তোমরা ভগবানকে আপন করিতে প্রয়াসী নহ, এই জন্যই জগতের সকলে তোমাদের পর রহিয়া গেল। এই জন্যই ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনের বাহিরে তোমাদের চিন্তা-চেষ্টা ধাবিত হইতেছে না। নিজের বাহিরে প্রতিবেশী, প্রতিবেশীদের বাহিরে গ্রামবাসী, গ্রামের বাহিরে জেলাবাসী, জেলার বাহিরে রাজ্যবাসী, রাজ্যের বাহিরে ভারতবাসী, ভারতের বাহিরে বিশ্ববাসী, এইভাবে সকলের জন্য কেন তোমাদের অন্তরের শুভবুদ্ধি বিসর্পিত হইতেছে না, তাহা তোমরা ভাবিয়া দেখ। ব্যক্তির কর্ত্তব্যের চাইতে সাংঘিক কর্ত্তব্য কেন তোমাদের কাছে তুচ্ছতর হইতেছে, ভাবিয়া দেখ। কূপমণ্ডূক কেবল নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও স্বার্থ নিয়া থাকে। তোমরা কূপমণ্ডূক রহিবে কেন?

সহর অথবা গ্রাম যেখানে যে থাক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনকে বহুকেন্দ্রিক করিতে তোমাদের হইবে। একের স্বার্থের উর্দ্ধে বহুর স্বার্থকে স্থান দিতে হইবে। বৃহত্তর কাজের মুখে নিজের ক্ষুদ্র সুবিধা-অসুবিধাকে ভুলিবার শিক্ষা অর্জ্জন করিতে হইবে।

কেবল যুক্তি, কেবল তর্ক তোমাদের অনেক মঙ্গল-প্রয়াসের মূলকে উচ্ছিন্ন করিতেছে। অপরের বৃহৎ সামর্থ্যে বৃহত্তর আয়োজনে

সুবৃহৎ কাজ হইয়া থাকে বলিয়াই তোমরা তোমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যকে ক্ষুদ্রতর আয়োজনে মহৎ কর্ত্তব্যে নিয়োজিত করিতে কুণ্ঠিত বা পরাঙ্মুখ হইবে কেন? কোথায় তোমাদের দুর্ব্বলতা? আত্মবিশ্বাসে না ঈশ্বর-বিশ্বাসে?

নিজেদের দুর্ব্বলতা নিজেরা খুঁজিয়া বাহির কর। অবিলম্বে আত্ম-সংশোধন কর। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমঙ্গল-হেতুতে আয়োজিত সংপ্রয়াসে তোমাদের সেতুবন্ধের কাঠবিড়ালীর সেবাটুটুকুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সংযোজিত কর। কল্যাণের, গৌরবের, উন্নতির ইহাই পথ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরি-ওঁ

কলিকাতা

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমাদের দুই জনেরই পত্র এক সঙ্গে পাইলাম।

কথিত আশ্রমটী হইতে তোমরা কেহ থাক সত্তর মাইল দূরে, কেহ বা একশত মাইল। অত দূর হইতে একটা আশ্রমের ব্যাপারে সহায়তা করা সহজ কথা নহে। তথাপি তোমরা সেখানে যাতায়াত করিয়া আশ্রমকর্ম্মীদের মনে যথেষ্ট উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে পার। আর পার স্থানীয় লোকদের মনে সহযোগ-বুদ্ধি সৃষ্টি করিতে। সুতরাং ইহা তোমরা সাধ্যমত করিও।

এই সময়ে আশ্রমে একটী নাম-কীর্ত্তন মহোৎসব করিতে চাহ, ভাল কথা। ইহার সুফল হইবেই এবং সেই সুফল হইবে বহুমুখীন। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষাত্মক প্রত্যেক অনুষ্ঠানই প্রত্যক্ষে পরোক্ষে বহুজনের বহু কল্যাণ করে। তৎসঙ্গে ইহা আশ্রমেরও কল্যাণ করিবে। কিন্তু আশ্রম-কর্ম্মীর মুখটী মিষ্টি না হইলে, আশ্রমের দিক দিয়া তাহার শুভফল দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। তোমরা তোমাদের বিশ্বস্ত আশ্রম কর্ম্মীটীকে মধুরভাষী হইতে বল।

মধুরভাষী হইতে টাকাকড়ি লাগে না, নিদারুণ তপস্যারও কিছু প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় অতি সাধারণ রকমের একটু ভদ্রতা-জ্ঞানের এবং অপরের সম্মান সম্পর্কে সহৃদয় বিবেচনার। আমরা মানুষের সহিত কর্কশ হইবার আগে তাহাকে আমাদের অপেক্ষা নীচ, নিন্দনীয় ও নারকী বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকি। নতুবা কর্কশ ভাষণ আমাদের কণ্ঠ দিয়া নিঃসৃত হইতে পারিত না। প্রতি জীবেই ব্রহ্ম বিরাজমান, এই বোধ অন্তরে থাকিলে মানুষ রুক্ষভাষী, দুর্ব্বিনীত, অশিষ্ট হইতে পারে না।

গৃহের গৃহস্থ বা আশ্রমের ব্রহ্মচারী, পরপ্রত্যাশী অলস আর স্বাবলম্বন-পরায়ণ নিরলস কর্ম্মী সকলেরই পক্ষে মধুরভাষিতা লাভজনক।

এই শিক্ষাটী তোমাদের হউক। আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরি-ওঁ কলিকাতা
২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। যদিও তোমাকে পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া মনে হইল না, তবু তোমার পত্রে তোমার যে বিবেকবান মূর্ত্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে আমি সম্ভ্রম করি।

গঙ্গাসাগরে যাইবার কালে তুমি প্রাণের আনন্দে আমাকে নিন্দা করিয়াছ। তাহাতে দোষ কিছুই হয় নাই। কর্ত্তব্য-বোধেই নিন্দা করিয়াছ। ইহার জন্য আবার অনুতাপ করিতেছ কেন?

কর্ত্তব্যবোধে আমাকে নিন্দা করিয়াছ, বেশ করিয়াছ। আজ যদি আবার কর্ত্তব্যবোধে প্রশংসা করিতে হয় করিবে। নিন্দা বা প্রশংসা সম্পর্কে আমার মনের প্রতিক্রিয়া সমান জানিও। নিন্দা করিয়াছ বলিয়া আবার আমার নিকটে ক্ষমা চাহিতে হইবে কেন? কর্ত্তব্য-বোধে যে যাহা করে, তাহা তাহার পক্ষে প্রশংসনীয়।

আমার আত্মপ্রচার-প্রবৃত্তি আমাকে মন্দ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছে বলিয়া যেদিন বুঝিয়াছিলে, সেই দিন আমাকে নিন্দা করিয়া তুমি ভাল কাজই ত' করিয়াছ। অন্যায়কে প্রবর্দ্ধিত হইতে দেখিলে তাহার প্রতিবাদ করা বিবেকবান্ ব্যক্তির পক্ষে কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া অনুতপ্ত হওয়া কোনও কাজের কথা নহে।

আজ যদি বুঝিয়া থাক যে, আমি যাহা করিয়াছি, তাহা আমার

আত্মপ্রচারই নহে, প্রচার একটা শক্তিমান আদর্শের, তবে করিতে হয় প্রশংসাই কর। তুমি নিজ কর্ত্তব্যের দিক তাকাইয়া যাহা নিন্দা করিবার করিও, যাহা প্রশংসা করিবার করিও, আমি উভয় অবস্থাতেই প্রসন্ন থাকিব। আমাকে তুমি একান্ত আপনার জন জানিয়া আমার সম্পর্কে একেবারে নির্ভয় থাকিও।

আপন জনের প্রশংসাগুলি বেশ আদর করিয়া বুকে ধরিব আর নিন্দাগুলিকে প্রাণপণে অপছন্দ করিব, ইহা কোনও সঙ্গত মনোভঙ্গী নহে। আপন জনের নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ই আমার নিকট সমান আদরণীয় হইবে। তোমার সহিত আমার ব্যবহারিক জগতে কোনও পূর্ব্বপরিচয় নাই বলিয়াই যে তুমি আমার পর, ইহা হইতে পারে না।

তুমিও জান না, আমিও জানি না, এমন একটী স্থানে অনন্তকাল আগেই তোমার আমার মিলনস্থাপিত হইয়া রহিয়াছে। আপন বলিয়াই নিন্দনীয় আচরণে নিন্দা কর, আবার তোমার বিচারে ভুল আছে বুঝিবামাত্র প্রশংসা আরম্ভ কর। তোমার সহিত আমার আপনত্বের সম্বন্ধ শাশ্বত ও সনাতন। তাই আমার নিন্দায় বা প্রশংসায় তোমার এত আগ্রহ।

তোমার সরলতায় মুগ্ধ হইয়াছি। তুমি জয়িষ্ণু হও এবং সর্ব্বজীবের প্রতি তোমার প্রেম প্রসারিত হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৯)

হরি-ওঁ

কলিকাতা
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। গুরুর কাছে সাধন নিয়া তারপরে যে আলস্যে কাল কাটায় না, তার মতন ভাগ্যধর আর কে আছে? মহৎ ভাগ্য তোমার, তাই তুমি নিষ্ঠার সহিত সাধন করিয়া যাইতেছ।

তোমার শ্রীগুরুদেব আর আমি মানুষ রূপে অভিন্ন নহি। দুইটী মানুষ দুইটী দেশে দুইটী কালে আবির্ভূত হইয়া দুই শ্রেণীর মানব-মনে নিজেদের কল্যাণাশিস ও মঙ্গলপ্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। সীমাবদ্ধ চোখে এই দুই জনের মধ্যে ঐক্য বা সাম্য আবিষ্কার করা সম্ভব নহে। খণ্ডিত বুদ্ধি নিয়া এই দুই জনের অনুবর্ত্তীরা সংঘে সংঘে কলহ ও দ্বেষ অনুশীলন পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। একদল ঈর্ষা করিয়া, একদল ঈর্ষিত হইয়া, একদল কুৎসা গাহিয়া, অপরদল ক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মিছামিছি শত্রু ও প্রতিপক্ষ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে ধর্ম্মের মনোহর উপবন লণ্ডভণ্ড হইয়া নষ্ট হয় এবং মরুভূমির মত জলহীন বৃক্ষহীন তৃণহীন নিষ্ঠুর দৃশ্যের অবতারণা করে। তার মধ্যে তোমার প্রাণের বিপুল শ্রদ্ধা যেন এক মরুকুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। তৃপ্তির সহিত দেখিয়া মুগ্ধ হই যে,

তুমি সকল গুরুর মধ্যে একই পরমগুরুর প্রকাশ দর্শন করিয়া ভিন্নতর স্থানে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আমার নিকটে আসিয়াছ সাধন-সম্পর্কিত নিগম-নিগূঢ় নির্দ্দেশনা পাইতে। তোমার উদারতার প্রশংসা করি, তোমার প্রাণের আগ্রহকে অভিনন্দন দেই।

তোমার প্রয়োজনীয় উপদেশগুলি তোমাকে দিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না। কিন্তু মা, আমি যেই উপদেশই দেই, তাহাই তুমি তোমার গুরুদেবের দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া নিও। সকল আচার্য্যদের প্রতি গুরুবুদ্ধি রাখিলেও স্বকীয় সাধনের প্রতি অপরিসীম নিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চরম অনুমোদনের স্থান একটী মাত্রই রাখিতে হয়। পত্নী যেমন স্বামীকে না জানাইয়া কোনও ব্যক্তির উপহার গ্রহণ করিতে পারে না, আর স্বামীর অনুমোদন হইলে নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তির প্রদত্ত উপহারও সাদরে স্বীকার করিয়া নিতে পারে, দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে নিজ দীক্ষাদাতা গুরু ব্যতীত অন্য আচার্য্যদের নিকট হইতে উপদেশ নিয়া তাহা নিজ গুরুর নিকট হইতে অনুমোদন করাইয়া নিতে হয়। ইহাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-বিরহিত হইয়া সাধন চলিতে থাকে।

সদ্‌গুরুদীক্ষিতের পক্ষে অন্যান্য আচার্য্যদের সঙ্গ করা মাত্র এই বুদ্ধিতেই উচিত যে, সকল গুরুই এক গুরুর প্রকাশ। কিন্তু নিজের লব্ধ সাধন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন সাধারণ অবস্থায় কখনো সঙ্গত নহে। সাধন-প্রণালীর মধ্যে পরিবর্ত্তন করিবার রুচি একবার আসিলে আর সেই রুচি একবার প্রশ্রয় পাইলে আস্তে আস্তে নিজ পথ হইতে

স্খলিত হইয়া সাধক কোন্ দিক্ দিয়া যে কোন্ দিকে চলিয়া যায়, তাহা কল্পনা করা কঠিন। সাধন-ভজনে এক নিষ্ঠারই মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, দার্শনিক চিন্তার ন্যায় ইহা ক্রমবিস্তারশীল নহে। সাধন-ভজন করিতে করিতে বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্য দিয়া সাধকের এক প্রকারের দার্শনিক মতবাদ আপনা আপনি সৃষ্ট, পুষ্ট ও বিস্তারিত হইতে থাকে, ইহা সত্য কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সাধকের পরিপূর্ণ নিষ্ঠা তাহার সাধন-কর্ম্মেই লাগিয়া থাকে। দার্শনিক চিন্তাশীল ব্যক্তি যুক্তি ও উপলব্ধির অগ্রগতির পথে আগাইতে আগাইতে কখনও কখনও এমন দুরধিগম্য স্থানে গিয়াও পৌঁছে, যেই স্থান হইতে তাহার পুরাতন স্থিতিস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য। তাই দার্শনিক চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে যে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার ক্ষতি নাই, সাধন-ভজন-পরায়ণ ব্যক্তির জন্য তাহা বিহিত হয় নাই। একনিষ্ঠ সাধকের পক্ষে একান্ত ভাবেই অপরিহার্য্য।

উত্তরদেশীয় আচার্য্যের নিকট হইতে সাধন-ভজনের একটুকু প্রকরণ গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণদেশীয় আচার্য্যের কাছ হইতে আর একটুকু নিলাম, তারপরে সাধন-রীতিটুকুকে বেশ একটু ব্যাপক মূর্ত্তিতে পাইবার জন্য পশ্চিমদেশীয় আচার্য্যের কতক প্রকরণ ইহার সঙ্গে যুক্ত করিলাম এবং পরিশেষে পূর্ব্বদেশীয় আচার্য্যের বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া লইয়া নিজ সাধন-ভজনের রীতিকে একটী বিশ্বজনীন সংস্করণ প্রদান করিলাম,—ইহা উদার চিন্তার দিক হইতে খুবই একটা মনোরম বস্তু হইতে পারে কিন্তু সাধন-সাফল্যের

দিক হইতে অতীব মারাত্মক বিপদ। কোনও সাধকেরই এমন বিপদে সাধিয়া মাথা পাতা উচিত নহে।

তোমার যখন বায়ুরোগ আছে এবং ভ্রূমধ্যে গুরুমূর্ত্তি ধ্যান করিতে মস্তিকের উদ্বেগ বর্দ্ধিত হয়, তখন যোগশাস্ত্রসম্মত এই সিদ্ধান্তই তোমার গ্রহণ করা উচিত যে, যেই হৃদয়ে নিয়ত তোমার সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি কখনো মন্দ, কখনো তীব্র ভাবে জাগিতেছে, সেই হৃদয়েই সর্ব্বদা শ্রীগুরু-ধ্যান করিবে। যাহাদের নিদ্রাল্পতাহেতু রাত্রের সাধন দুর্ব্বল এবং প্রাতঃকালীন মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত, তাহাদের পক্ষে যোগ-শাস্ত্রসম্মত বিধান এই যে, শয়নকালে নাভিমূলে শ্রীগুরু-ধ্যান জমাইবে। অনেকের এমনও হয় যে, কামেন্দ্রিয়ের নানা চাঞ্চল্যহেতু কিছুতেই সাধনে মন বসাইতে পারে না, যতবার মনকে ভ্রূমধ্যে, হৃৎপদ্মে বা নাভিমূলে বসাইতে চাহে, ততবারই মন নানা অবান্তর যৌন বিষয় চিন্তা করিয়া করিয়া কেবল অধোগামীই হইতেছে। এমতাবস্থায় গুহ্যমূল, উপস্থমূল ও নাভিমূল এই তিনটী ধ্যানক্ষেত্র ব্যাপিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীগুরুর ধ্যান যোগিগণের উপলব্ধি-সম্মত ব্যবস্থা। আমি সাধক-গণের ব্যবহার-সিদ্ধ উপদেশ দিলাম। তোমার শ্রীগুরুদেবের অনুমোদন পাইবার পরে আমার এই উপদেশ যতটুকু প্রয়োজন পালন করিও।

আমার দীক্ষিত সন্তানেরা কেহ কেহ মাঝে মাঝে তোমার গৃহে যায় এবং তোমাকে ও অন্যান্যকে আমার উপদেশ-বাণী শ্রবণ করায় শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। তাহারা যদি আমার বাণীতে মধুর আস্বাদ

পাইয়া থাকে, তাহা হইলে সকলকে ইহা সদ্বুদ্ধি নিয়া শ্রবণ করান তাহাদের পক্ষে খুবই সঙ্গত কার্য্য হইতেছে। কিন্তু তোমরা যাহারা আমার নিকটে দীক্ষিত নহ এবং তোমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে যাহারা আমার নিকটে কখনও দীক্ষা নিবেন না, সকলেই নিজ নিজ বর্ত্তমান ও ভাবী দীক্ষাগুরুদের মূল নির্দ্দেশের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া নিয়া আমার কথা যতটুকু নিতে পার, নিবে। সমগ্র জগতের কল্যাণের দিকে তাকাইয়াই আমি জীবনের প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-পরিত্যাগ করিতেছি, আমার সকল বাণী বিশ্ববাসীর দিকে তাকাইয়া। কিন্তু সকলেই একমাত্র আমারই অনুবর্ত্তী হউক, এই কামনা আমার নাই। যাঁহার অনুবর্ত্তী হইলে যাহার প্রকৃষ্টতম কল্যাণ, সে যেন তাঁহারই অনুবর্ত্তী হয়। জগতের সকলের অনুবর্ত্তীদের জন্যই আমার বাণী, কেবল আমার অনুবর্ত্তীদের জন্য নহে। আমার যতটুকু কথা নিজ নিজ গুরুর নির্দ্দেশের সহিত অবিরোধী ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে, মাত্র ততটুকু নিও।

পুনরায় প্রাণভরা আশিস জানাইতেছি। তোমার ইষ্টনিষ্ঠা তোমাকে পরম কুশল আহরণে সমর্থ করুক। তোমার সাধন-সিদ্ধি নিখিল বিশ্বের মঙ্গলবর্দ্ধন করুক। তোমার একার জীবন বিশ্ববাসীর জীবনে লীন হউক। তোমার নিজের তপস্যা সকলের তপোবল বর্দ্ধিত করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

"ইষ্টমন্ত্র জগতের সর্ব্বমন্ত্রসার,
একমাত্র ইষ্টনামে জগৎ-উদ্ধার।
দেহ, মন, মেধা, বুদ্ধি, চিত্ত, আত্মা, প্রাণ
একমাত্র ইষ্টনামে সবার কল্যাণ।"

—স্বরূপানন্দ

(তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত)